# সপ্তবিংশতি অধ্যায়

# জড়া প্রকৃতির উপলব্ধি

## শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ।
অবিকারাদকর্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ ॥ ১ ॥

**শ্রী-ভগবান্ উবাচ**—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **প্রকৃতি-স্থঃ**—জড় শরীরে অবস্থান করে; **অপি**—যদিও; **পুরুষঃ**—জীব; **ন**—না; **অজ্যতে**—প্রভাবিত হয়; **প্রাকৃতৈঃ**—জড়া প্রকৃতির; **গুণৈঃ**—গুণসমূহের দ্বারা; **অবিকারাৎ**—পরিবর্তিত না হয়ে; **অকর্তৃত্বাৎ**—কর্তৃত্ব অভিমান থেকে মুক্ত হওয়ার দ্বারা; **নির্গুণত্বাৎ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে; **জল**—জলে; **অর্কবৎ**—সূর্যের মতো।

### অনুবাদ

**ভগবান কপিলদেব বলতে লাগলেন—বিকার-রহিত এবং কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হওয়ার ফলে, জীব যখন এইভাবে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা অপ্রভাবিত থাকে, তখন জড় দেহে অবস্থান করলেও সে গুণের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকে, ঠিক যেমন সূর্য তার জলের প্রতিবিম্ব থেকে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে।**

### তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ভগবান কপিলদেব সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কেবল ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন শুরু করার ফলেই ভগবৎ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার দিব্য জ্ঞান এবং বৈরাগ্য লাভ করা যায়। এখানেও সেই সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হয়েছে। যে মানুষ জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত, তিনি ঠিক জলে সূর্যের প্রতিবিম্বের মতো অবস্থান করেন। সূর্য যখন জলে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন জলের আন্দোলন অথবা শীতলতা বা অস্থিরতা সূর্যকে প্রভাবিত করতে পারে না। তেমনই *বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ*

*প্রযোজিতঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৭)—কেউ যখন পূর্ণরূপে ভক্তিযোগে যুক্ত হন, তখন তিনি ঠিক জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যের মতো হয়ে যান। যদিও ভক্ত জড় জগতে রয়েছেন বলে মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে তিনি চিৎ-জগতে রয়েছেন। ঠিক যেমন সূর্যের প্রতিবিম্ব জলে রয়েছে বলে মনে হলেও, প্রকৃত পক্ষে সূর্য সেই জল থেকে কোটি-কোটি মাইল দূরে রয়েছে, ঠিক তেমনই ভক্তিযোগে যিনি যুক্ত হয়েছেন, তিনি নির্গুণ বা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত।

*অবিকার* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরিবর্তন-রহিত।' *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তাই তার শাশ্বত স্থিতি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সহযোগিতা করা অথবা তার শক্তিকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা। সেটিই তার অপরিবর্তনীয় স্থিতি। যখনই সে তার শক্তি এবং কার্যকলাপ তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নিয়োগ করে, তখন তার অবস্থার পরিবর্তনকে বলা হয় *বিকার*। তেমনই, এই জড় দেহেও, তিনি যখন সদ্গুরুর নির্দেশে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তখন তিনি অবিকার স্থিতি প্রাপ্ত হন, কেননা সেইটি হচ্ছে তাঁর স্বাভাবিক কর্তব্য। *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুক্তি মানে হচ্ছে স্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। জীবের স্বরূপগত স্থিতি হচ্ছে ভগবানের সেবা করা, (*ভক্তিযোগেন, ভক্ত্যা*)। কেউ যখন জড়-জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, সেটিই হচ্ছে অবিকারত্ব। *অকর্তৃত্বাৎ* মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য কোন কিছু না করা। কেউ যখন তার নিজের দায়িত্বে কোন কিছু করে, তখন তার কর্তৃত্বাভিমান থাকে এবং তার ফলে সেই কর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হয়, কিন্তু কেউ যখন সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের জন্য করেন, তখন আর কোন রকম কর্তৃত্বাভিমান থাকে না। অবিকারত্ব এবং অকর্তৃত্বের ফলে, মানুষ তৎক্ষণাৎ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, যেখানে জড়া প্রকৃতির গুণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, ঠিক যেমন সূর্যের প্রতিবিম্ব জলের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

## শ্লোক ২

**স এষ যর্হি প্রকৃতের্গুণেষ্বভিবিষজ্জতে ।**
**অহংক্রিয়াবিমূঢ়াত্মা কর্তাস্মীত্যভিমন্যতে ॥ ২ ॥**

**সঃ**—সেই জীবাত্মা; **এষঃ**—এই; **যর্হি**—যখন; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **গুণেষু**—গুণে; **অভিবিষজ্জতে**—মগ্ন হয়; **অহংক্রিয়া**—অহঙ্কারের দ্বারা; **বিমূঢ়**—মোহাচ্ছন্ন; **আত্মা**—জীবাত্মা; **কর্তা**—কর্তা; **অস্মি**—আমি হই; **ইতি**—এইভাবে; **অভিমন্যতে**—মনে করে।

## অনুবাদ

**আত্মা যখন জড়া প্রকৃতির মোহ এবং অহঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে, তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, তখন সে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন হয়, এবং অহঙ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে নিজেকে সব কিছুর কর্তা বলে মনে করে।**

## তাৎপর্য

প্রকৃত পক্ষে বদ্ধ জীবকে প্রকৃতির গুণের বশীভূত হয়ে কার্য করতে বাধ্য হতে হয়। জীবের কোন রকম স্বাধীনতা নেই। সে যখন পরমেশ্বর ভগবানের পরিচালনার অধীন থাকে তখন সে মুক্ত, কিন্তু যখন সে তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের কার্যে যুক্ত হয়, তখন সে প্রকৃত পক্ষে জড়া প্রকৃতির মোহে আচ্ছন্ন হয়। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি*—জীব জড়া প্রকৃতির বিশেষ গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কার্য করে। গুণ মানে হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণ। জীব জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন, কিন্তু ভ্রান্তভাবে সে মনে করে যে, সে হচ্ছে কর্তা। পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর যথার্থ প্রতিনিধি সদ্গুরুর নির্দেশে কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন তিনি অনায়াসে এই ভ্রান্ত কর্তৃত্ববোধ থেকে মুক্ত হতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন যুদ্ধে তাঁর পিতামহ এবং গুরুকে বধ করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশনায় কার্য করতে শুরু করেন, তখন তিনি সেই ভ্রান্ত কর্তৃত্ববোধ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধের ফলাফল থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। যদিও তিনি প্রথমে যুদ্ধ করতে না চেয়ে অহিংস হয়েছিলেন, কিন্তু তবুও তার পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর উপর ছিল। সেটিই হচ্ছে মুক্ত এবং বদ্ধ অবস্থার মধ্যে পার্থক্য। বদ্ধ জীবাত্মা খুব ভাল হতে পারে, এবং সত্ত্বগুণে কার্য করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু একজন ভক্ত সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় কর্ম করেন। তাই সাধারণ মানুষের কাছে তার কার্যকলাপ খুব উচ্চ স্তরের বলে মনে না হতে পারে, কিন্তু ভক্ত সব রকম দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত।

## শ্লোক ৩

তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্যনির্বৃতঃ ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু ॥ ৩ ॥

**তেন**—তার দ্বারা; **সংসার**—জন্ম এবং মৃত্যুর আবর্ত; **পদবীম্**—পথ; **অবশঃ**—অসহায়ভাবে; **অভ্যেতি**—ভোগ করে; **অনির্বৃতঃ**—অসন্তুষ্ট; **প্রাসঙ্গিকৈঃ**—জড়া প্রকৃতির সঙ্গ প্রভাবে; **কর্ম-দোষৈঃ**—ভুল কর্মের ফলে; **সৎ**—ভাল; **অসৎ**—খারাপ; **মিশ্র**—মিশ্রিত; **যোনিষু**—বিভিন্ন যোনিতে।

## অনুবাদ

**এইভাবে বদ্ধ জীব প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে, উচ্চ এবং নীচ বিভিন্ন যোনিতে দেহান্তরিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়, ততক্ষণ তাকে তার কর্মদোষে এই অবস্থা স্বীকার করতে হয়।**

## তাৎপর্য

এখানে *কর্মদোষৈঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ভ্রান্ত কর্মের ফলে।' তা এই জড় জগতে সম্পাদিত ভাল এবং মন্দ—সমস্ত কর্মকেই বোঝায়। জড় সঙ্গ প্রভাবে, এই জগতের সমস্ত কর্মই কলুষিত এবং ত্রুটিপূর্ণ। মূর্খ বদ্ধ জীবেরা মনে করতে পারে যে, জনসাধারণের জাগতিক কল্যাণের জন্য হাসপাতাল খুলে অথবা জড়-জাগতিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় খুলে তারা দান করছে, কিন্তু তারা জানে না যে, তাদের এই সমস্ত কর্মও ত্রুটিপূর্ণ, কেননা তা তাদের এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হওয়ার পন্থা থেকে মুক্তি দান করতে পারবে না। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*সদসন্মিশ্রযোনিষু*। অর্থাৎ, কেউ এই জড় জগতে তথাকথিত পুণ্য কর্মের ফলে অতি উচ্চ কুলে অথবা উচ্চতর লোকে দেবতাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত কর্মও ত্রুটিপূর্ণ কেননা তা মুক্তি দান করে না। খুব ভাল স্থানে অথবা উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করা মানে এই নয় যে, সে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির জড়-জাগতিক ক্লেশকে এড়িয়ে চলতে পারে। মায়ার প্রভাবে বদ্ধ জীব বুঝতে পারে না যে, তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য যে-কর্মই সে করছে তা সবই ত্রুটিপূর্ণ, এবং ভগবদ্ভক্তিই কেবল তাকে এই সমস্ত ত্রুটিপূর্ণ কর্মের ফল থেকে মুক্ত করতে পারে। যেহেতু সে এই সমস্ত ত্রুটিপূর্ণ কর্ম থেকে বিরত হয় না, তাই তাকে উচ্চ এবং নীচ বিভিন্ন দেহে দেহান্তরিত

হতে হয়। তাকে বলা হয় *সংসার-পদবীম্*, অর্থাৎ এই জড় জগৎ, যেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না। এই জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে যিনি মুক্ত হতে চান, তাকে ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম করতে হবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

## শ্লোক ৪

**অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে ।**
**ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ৪ ॥**

**অর্থে**—প্রকৃত কারণ; **হি**—নিশ্চয়ই; **অবিদ্যমানে**—বিদ্যমান নয়; **অপি**—যদিও; **সংসৃতিঃ**—জড়-জাগতিক অবস্থা; **ন**—না; **নিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয়; **ধ্যায়তঃ**—মনোনিবেশ করে; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **অস্য**—জীবের; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **অনর্থ**—অসুবিধার; **আগমঃ**—আগমন; **যথা**—যেমন।

### অনুবাদ

**প্রকৃত পক্ষে জীব জড় অস্তিত্বের অতীত, কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার মনোভাবের ফলে, তার ভববন্ধনের নিবৃত্তি হয় না, এবং সে স্বপ্নবৎ নানা রকম অনর্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়।**

### তাৎপর্য

এখানে স্বপ্নের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার মানসিক অবস্থার ফলে, স্বপ্নের মধ্যে আমরা নানা রকম সুবিধাজনক এবং অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পতিত হই। তেমনই, জীবাত্মার এই জড় জগতে করণীয় কিছু নেই; কিন্তু আধিপত্য করার মনোভাবের ফলে, তাকে ভববন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়।

বদ্ধ অবস্থাকে এখানে *ধ্যায়তো বিষয়ানস্য* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *বিষয়* মানে 'উপভোগের বস্তু'। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত মনে করে যে, সে জড়-জাগতিক সুবিধাগুলি উপভোগ করতে পারে, ততক্ষণ তাকে বদ্ধ অবস্থায় থাকতে হয়, কিন্তু যখনই সে প্রকৃতিস্থ হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে, সে ভোক্তা নয়, কেননা একমাত্র ভোক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তিনি সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা *(ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্)*, এবং তিনিই ত্রিভুবনের অধীশ্বর *(সর্বলোকমহেশ্বরম্)*। তিনি সমস্ত জীবের প্রকৃত সুহৃৎ। কিন্তু

ঈশ্বরত্ব, ভোক্তৃত্ব এবং সমস্ত জীবের সুহৃদত্ব ভগবানের উপর অর্পণ করার পরিবর্তে, আমরা ঈশ্বর, ভোক্তা এবং সুহৃৎ হওয়ার দাবি করছি। আমরা নিজেদেরকে মানব-সমাজের হিতৈষী বলে মনে করে জনকল্যাণের কার্য করি। কেউ দাবি করতে পারে যে, সে হচ্ছে খুব বড় রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, সমস্ত মানুষের এবং দেশের শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে কখনই সকলের শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ হতে পারে না। একমাত্র সুহৃৎ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। বদ্ধ জীবের চেতনাকে সেই স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে কৃষ্ণ যে তাদের প্রকৃত সুহৃদ, সেই কথা তারা বুঝতে পারে। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, তা হলে তিনি কখনও প্রতারিত হবেন না, এবং তিনি সমস্ত বাঞ্ছিত সহায়তা প্রাপ্ত হবেন। বদ্ধ জীবের এই চেতনার উন্মেষই হচ্ছে সব চাইতে বড় সেবা। অন্য জীবের শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ হওয়ার অভিনয় করা কোন সেবা নয়। মিত্রতার শক্তি সীমিত। যদিও কেউ বন্ধু বলে দাবি করেন, তিনি কখনই অন্তহীনভাবে বন্ধু হতে পারে না। অসংখ্য জীব রয়েছে, এবং আমাদের ক্ষমতা সীমিত; তাই আমরা জনসাধারণের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করতে পারি না। জনসাধারণের সর্ব শ্রেষ্ঠ সেবা হচ্ছে তাদের কৃষ্ণভাবনা জাগরিত করা, যাতে তারা জানতে পারে যে, পরম ভোক্তা, পরম ঈশ্বর এবং পরম সুহৃৎ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তখন জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার মোহময়ী স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে।

## শ্লোক ৫

**অত এব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি ।**
**ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশম্ ॥ ৫ ॥**

**অতঃ এব**—অতএব; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **চিত্তম্**—মন, চেতনা; **প্রসক্তম্**—আসক্ত; **অসতাম্**—জড় সুখভোগের; **পথি**—পথে; **ভক্তিযোগেন**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **তীব্রেণ**—অত্যন্ত ঐকান্তিক; **বিরক্ত্যা**—আসক্তি-রহিত; **চ**—এবং; **নয়েৎ**—আনতে হবে; **বশম্**—বশে।

## অনুবাদ

**প্রতিটি বদ্ধ জীবের কর্তব্য হচ্ছে জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত তার কলুষিত চেতনাকে বৈরাগ্য সহকারে অত্যন্ত ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। তার ফলে তার মন এবং চেতনা পূর্ণরূপে বশীভূত হবে।**

## তাৎপর্য

এই শ্লোকে মুক্তির পন্থা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জীব নিজেকে ভোক্তা, ঈশ্বর অথবা সমস্ত জীবের সুহৃৎ বলে মনে করার ফলে, জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই ভ্রান্ত ধারণা ইন্দ্রিয় সুখভোগে অভিনিবেশের পরিণাম। কেউ যখন নিজেকে তার দেশবাসীর, সমাজের অথবা মনুষ্যকুলের শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ বলে মনে করে, তখন সে নানা প্রকার জাতীয়তাবাদী, মানব-হিতৈষী এবং পরার্থবাদী কার্যকলাপে যুক্ত হয়। এ সবই কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগে অভিনিবেশের ফল। তথাকথিত সমস্ত রাষ্ট্রনেতা বা মানব-হিতৈষীরা সকলের সেবা করে না; তারা কেবল তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়ের সেবা করে। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত সত্য। কিন্তু বদ্ধ জীবেরা সেই কথা বুঝতে পারে না কেননা তারা মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন। তাই এই শ্লোকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সকলেই যেন ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। তার অর্থ হচ্ছে যে, কেউ যেন নিজেকে প্রভু, অন্যের উপকারক বন্ধু অথবা ভোক্তা বলে মনে না করে। তার সব সময় মনে রাখা উচিত যে, প্রকৃত ভোক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; সেটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের মূল তত্ত্ব। তিনটি বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস থাকা অবশ্য কর্তব্য—শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর মালিক, তিনি হচ্ছেন ভোক্তা এবং তিনি হচ্ছেন সকলের সুহৃৎ। এই সিদ্ধান্ত নিজে জানাই যথেষ্ট নয়, মানুষের চেষ্টা করা উচিত অন্যদের সেই বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করা এবং কৃষ্ণভক্তির প্রচার করা।

যখনই মানুষ এই প্রকার নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তৎক্ষণাৎ জড়া প্রকৃতির উপর মিথ্যা আধিপত্য করার প্রবণতা আপনা থেকে দূর হয়ে যায়। সেই অনাসক্তিকে বলা হয় *বৈরাগ্য*। তথাকথিত জড়-জাগতিক প্রভুত্ব করার চেষ্টায় মগ্ন হওয়ার পরিবর্তে, কেউ যখন কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হন, সেটিই হচ্ছে চেতনাকে বশীভূত করার পন্থা। যোগের পন্থায় ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে হয়। *যোগ ইন্দ্রিয়সংযমঃ*। ইন্দ্রিয়গুলি যেহেতু সর্বদাই সক্রিয়, তাদের কার্যকলাপ তাই ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত করা উচিত—তাদের কার্যকলাপ বন্ধ করা যায় না। কেউ যদি কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করতে চায়, তা হলে তার সেই প্রচেষ্টা অবশ্যই সফল হবে না। এমন কি বিশ্বামিত্রের মতো মহান যোগীও, যিনি যোগ অভ্যাসের দ্বারা তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার চেষ্টা করছিলেন, তিনিও মেনকার সৌন্দর্যের শিকার হয়েছিলেন। এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মন এবং চেতনা পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত না হলে, সব সময়ই মনের ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এই শ্লোকে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, *প্রসক্তমসতাং পতি*—মন সর্বদাই অসৎ বা অনিত্য জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত। যেহেতু আমরা অনাদি কাল ধরে জড়া প্রকৃতির সংসর্গে রয়েছি, তাই আমরা এই অনিত্য জগতের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছি। মনকে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য শ্রীপাদপদ্মে স্থির করতে হবে। *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*। মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে স্থির করতে হবে; তা হলেই সব কিছু ঠিক হতে পারে। এইভাবে ভক্তিযোগের গুরুত্ব এই শ্লোকে দৃঢ়তাপূর্বক প্রতিপন্ন হয়েছে।

## শ্লোক ৬

**যমাদিভির্যোগপথৈরভ্যসঞ্ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।**
**ময়ি ভাবেন সত্যেন মৎকথাশ্রবণেন চ ॥ ৬ ॥**

**যম-আদিভিঃ**—যম ইত্যাদি; **যোগ-পথৈঃ**—যোগ-পদ্ধতির দ্বারা; **অভ্যসন্**—অভ্যাস করে; **শ্রদ্ধয়া অন্বিতঃ**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **ময়ি**—আমাকে; **ভাবেন**—ভক্তি সহ; **সত্যেন**—বিশুদ্ধ; **মৎ-কথা**—আমার সম্বন্ধীয় কাহিনী; **শ্রবণেন**—শ্রবণের দ্বারা; **চ**—এবং।

### অনুবাদ

**যম আদি যোগের বিভিন্ন পন্থার অনুশীলনের দ্বারা শ্রদ্ধাবান হওয়া, এবং আমার কথা শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।**

### তাৎপর্য

যোগের অনুশীলন হয় আটটি বিভিন্ন স্তরে—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। যম এবং নিয়ম মানে হচ্ছে কঠোর নিয়ম অনুশীলনের দ্বারা সংযমের অভ্যাস করা, এবং আসন হচ্ছে উপবেশনের বিভিন্ন মুদ্রা। এইগুলি ভগবদ্ভক্তিতে শ্রদ্ধার স্তরে উন্নীত হতে সাহায্য করে। শারীরিক ব্যায়ামের দ্বারা যোগ অভ্যাস করাই চরম লক্ষ্য নয়; প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিতে শ্রদ্ধাপরায়ণ হতে মনকে সংযত করে একাগ্র করা।

*ভাবেন* বা *ভাব* শব্দটি যোগ অভ্যাসের অথবা যে-কোন পারমার্থিক পন্থার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) *ভাব* শব্দটির ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, *বুধা ভাবসমন্বিতাঃ*—ভগবৎ প্রেমে মগ্ন হওয়া উচিত। কেউ যখন জানতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর উৎস এবং তাঁর থেকেই সব কিছুর প্রকাশ হয় *(অহং সর্বস্য প্রভবঃ)*, তখন *জন্মাদ্যস্য যতঃ* ('সব কিছুর আদি উৎস') বেদান্ত সূত্রটি হৃদয়ঙ্গম করা যায়, এবং তখন তিনি *ভাব* বা ভগবৎ প্রেমের প্রাথমিক অবস্থায় মগ্ন হতে পারেন।

*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে এই *ভাব* বা ভগবৎ প্রেমের প্রাথমিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রথমে শ্রদ্ধাযুক্ত হতে হয় *(শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ)*। যোগের বিধি-নিষেধ এবং আসন ইত্যাদির অভ্যাসের দ্বারা অথবা পূর্ববর্তী শ্লোকের উপদেশ অনুসারে, সরাসরিভাবে ভক্তিযোগে যুক্ত হয়ে, ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার মাধ্যমে শ্রদ্ধা লাভ হয়। ভক্তিযোগের নয়টি অঙ্গের মধ্যে, প্রথম এবং সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভগবানের কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করা। সেই কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। *মৎকথাশ্রবণেন চ*। যোগের বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করার দ্বারা শ্রদ্ধার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, এবং সেই লক্ষ্যই আবার সাধিত হয় কেবল ভগবানের দিব্য লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করার দ্বারা। এখানে *চ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তিযোগ হচ্ছে সরাসরি পন্থা, এবং অন্যান্য পন্থাগুলি পরোক্ষ। কিন্তু সেই পরোক্ষ পন্থাও যদি গ্রহণ করা হয়, তবুও ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের সরাসরি পন্থাটি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সাফল্য লাভ হয় না। তাই এখানে *সত্যেন* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সম্পর্কে শ্রীধর স্বামী মন্তব্য করেছেন যে, *সত্যেন* শব্দটির অর্থ হচ্ছে *নিষ্কপটেন*—'কপটতা-বিহীন।' নির্বিশেষবাদীরা কপটতায় পূর্ণ। কখনও কখনও তারা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ভান করে, কিন্তু তাদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। এইটি কপটতা। *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই প্রকার কপটতা অনুমোদন করা হয়নি। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *পরমো নির্মৎসরাণাম্*—"এই *শ্রীমদ্ভাগবত* তাঁদেরই জন্য যাঁরা সম্পূর্ণরূপে মাৎসর্য থেকে মুক্ত হয়েছেন।" সেই একই বিষয়ের উপর এখানেও জোর দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনে মগ্ন হওয়া যায়, ততক্ষণ মুক্তি লাভের কোনই সম্ভাবনা নেই।

## শ্লোক ৭

**সর্বভূতসমত্বেন নির্বৈরেণাপ্রসঙ্গতঃ ।**
**ব্রহ্মচর্যেণ মৌনেন স্বধর্মেণ বলীয়সা ॥ ৭ ॥**

**সর্ব**—সমস্ত; ভূত—জীব; **সমত্বেন**—সমভাবে দর্শনের দ্বারা; **নির্বৈরেণ**—শত্রুতা বিনা; **অপ্রসঙ্গতঃ**—ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিনা; **ব্রহ্ম-চর্যেণ**—ব্রহ্মচর্যের দ্বারা; **মৌনেন**—মৌনব্রতের দ্বারা; **স্ব-ধর্মেণ**—স্বধর্মের দ্বারা; **বলীয়সা**—কর্মফল নিবেদনের দ্বারা।

## অনুবাদ

**ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হলে, সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হয়, কারও প্রতি বৈরীভাব পোষণ করতে নেই, কারও সঙ্গে আবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও রাখতে নেই। ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়, মৌনব্রত অবলম্বন করতে হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত কর্মের ফল নিবেদন করে স্বধর্ম অনুষ্ঠান করতে হয়।**

## তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক সেবায় যুক্ত ভগবদ্ভক্ত সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী। বিভিন্ন প্রকারের জীব রয়েছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদের বাইরের আবরণটি দর্শন করেন না; তিনি দেহের অভ্যন্তরে বিরাজ করছে যে-আত্মা তাকে দর্শন করেন। যেহেতু প্রতিটি জীবাত্মাই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তিনি তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। সেইটি হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তের দর্শন। *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্ত বা তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি একজন ব্রাহ্মণ, একটি কুকুর, একটি হাতি, একটি গাভী অথবা একজন চণ্ডালের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না, কেননা তিনি জানেন যে, দেহটি কেবল বাইরের আবরণ মাত্র, এবং আত্মা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ভক্ত কখনও কারও প্রতি শত্রুভাব পোষণ করেন না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সকলের সঙ্গেই মেলামেশা করেন। তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। অপ্রসঙ্গতঃ মানে 'সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না করা।' ভগবদ্ভক্ত ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনেই কেবল আগ্রহী, এবং তাই তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য কেবল ভক্তদের সঙ্গেই তাঁর সঙ্গ করা উচিত। অন্য কারও সঙ্গে মেলামেশা করার কোন প্রয়োজন তাঁর নেই, কেননা যদিও তিনি কাউকে তাঁর শত্রু বলে মনে করেন না, তবুও তিনি কেবল তাঁদের সঙ্গেই মেলামেশা করেন, যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত।

ভক্তকে ব্রহ্মচর্যের ব্রত পালন করতে হয়। ব্রহ্মচর্য পালন করার অর্থ এই নয় যে, সম্পূর্ণরূপে যৌন জীবন থেকে মুক্ত হতে হবে; পত্নী সহ সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন যাপন করাও ব্রহ্মচর্য ব্রতের অন্তর্গত। যৌন জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাই সব চাইতে ভাল। সেটিই কাম্য। তা সম্ভব না হলে, ভক্ত ধর্মের অনুশাসন অনুসারে, বিবাহ করে স্ত্রী সহ শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারেন।

ভক্তের অনর্থক কথা বলা উচিত নয়। ঐকান্তিক ভক্তের অর্থহীন বাক্যালাপ করার কোন সময় নেই। তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভক্তিতে ব্যস্ত থাকেন। যখন তিনি কথা বলেন, তখন তিনি কেবল কৃষ্ণের কথাই বলেন। *মৌন* মানে হচ্ছে 'নীরবতা'। মৌন মানে একেবারেই কিছু না বলা নয়, তার অর্থ হচ্ছে কোন অনর্থক বাক্য ব্যয় না করা। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে কথা বলার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী। এখানে যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে *স্বধর্মেণ*, অর্থাৎ নিজের নিত্য কর্মে একান্তভাবে যুক্ত থাকা, যার অর্থ হচ্ছে ভগবানের নিত্যদাসরূপে কার্য করা বা কৃষ্ণভক্তি করা। পরবর্তী শব্দ *বলীয়সা*, এর অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত কার্যের ফল ভগবানকে নিবেদন করা।' ভক্ত কখনও তাঁর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কোন কার্য করেন না। তিনি যা কিছু উপার্জন করেন, যা কিছু খান এবং যা কিছু করেন, তা সবই তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নিবেদন করেন।

## শ্লোক ৮

**যদৃচ্ছয়োপলব্ধেন সন্তুষ্টো মিতভুঙ্মুনিঃ ।**
**বিবিক্তশরণঃ শান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্ ॥ ৮ ॥**

**যদৃচ্ছয়া**—অনায়াসে; **উপলব্ধেন**—যা লাভ হয়েছে তার দ্বারা; **সন্তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **মিত**—অল্প; **ভুক্**—আহারী; **মুনিঃ**—চিন্তাশীল; **বিবিক্ত-শরণঃ**—নির্জন স্থানে বাস করে; **শান্তঃ**—শান্ত; **মৈত্রঃ**—মৈত্রী-ভাবাপন্ন; **করুণঃ**—দয়ালু; **আত্ম-বান্**—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ।

## অনুবাদ

**ভক্তের উচিত অনায়াসে যা উপার্জন করা যায় তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। তাঁর প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা উচিত নয়। তাঁর নির্জন স্থানে বাস করা উচিত এবং সর্বদাই চিন্তাশীল, শান্ত, মৈত্রীপূর্ণ, দয়ালু এবং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ হওয়া উচিত।**

## তাৎপর্য

যারা জড় শরীর ধারণ করেছে, তাদের কার্য করে অথবা জীবিকা উপার্জন করে দেহের আবশ্যকতাগুলি পূরণ করতে হয়। একান্তই যা প্রয়োজন, তা উপার্জন করার জন্যই কেবল ভক্তকে কর্ম করতে হয়। সেই প্রকার আয়ের দ্বারাই তাঁকে সব সময় সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং অনাবশ্যক ধন সংগ্রহ করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা করা উচিত নয়। বদ্ধ অবস্থায় যে-মানুষের কাছে ধন নেই, সে সর্বদাই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার জন্য ধন উপার্জন করার চেষ্টায় অত্যন্ত কঠোরভাবে পরিশ্রম করে। কপিলদেব উপদেশ দিয়েছেন যে, কঠোর পরিশ্রম ছাড়া যা আপনা থেকেই লাভ হয়, তার জন্য অনর্থক পরিশ্রম করা উচিত নয়। এই সম্পর্কে *যদৃচ্ছয়া* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে প্রতিটি জীবেরই তার বর্তমান শরীরে পূর্ব নির্ধারিত সুখ এবং দুঃখ রয়েছে; তাকে বলা হয় কর্মের নিয়ম। এমন নয় যে, কেবল পরিশ্রমের দ্বারাই মানুষের পক্ষে ধন সংগ্রহ করা সম্ভব, তা হলে প্রায় সকলেই সমান ধনী হত। প্রকৃত পক্ষে সকলেই তাদের পূর্ব নির্ধারিত কর্ম অনুসারে উপার্জন করছে এবং ধন সম্পদ লাভ করছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* সিদ্ধান্ত অনুসারে, কোন রকম প্রচেষ্টা ব্যতীতই আমাদের কখনও কখনও বিপদের সম্মুখীন হতে হয় অথবা দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা প্রাপ্ত হতে হয়, তেমনই কোন রকম পরিশ্রম ব্যতীতই সুখ এবং সমৃদ্ধিপূর্ণ অবস্থাও আসবে। আমাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের অদৃষ্ট অনুসারে সেইগুলি আসুক। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের মূল্যবান সময় কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনে নিয়োগ করা। অর্থাৎ, জীবের তার স্বাভাবিক অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যদি অদৃষ্টের বশে কাউকে এমন একটি পরিস্থিতি লাভ করতে হয়, যা অন্যদের তুলনায় খুব একটা সমৃদ্ধিশালী নয়, তা হলেও বিচলিত হওয়া উচিত নয়। তার কর্তব্য হচ্ছে কেবল কৃষ্ণভক্তিতে অগ্রসর হওয়ার জন্য তার মূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করা। কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন জড়-জাগতিক সমৃদ্ধি অথবা দুঃখ-দুর্দশার উপর নির্ভর করে না; তা জড়-জাগতিক জীবনের অবস্থাগুলি থেকে মুক্ত। একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তির মতো একজন অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও কৃষ্ণভক্তি সম্পাদন করতে পারেন। অতএব ভগবান তাঁকে যে অবস্থায় রেখেছেন, সেই অবস্থাতেই তাঁর অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

এখানে আর একটি শব্দ হচ্ছে *মিতভুক্*। তার অর্থ হচ্ছে দেহ ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই আহার করা উচিত। রসনার তৃপ্তির জন্য অত্যাহার করা উচিত নয়। শস্য, ফল, দুধ ইত্যাদি মানুষের আহার। রসনার তৃপ্তির জন্য মানুষকে অত্যধিক আগ্রহী হয়ে, মানুষের আহার্য নয় যে সমস্ত বস্তু সেইগুলি খাওয়া

উচিত নয়। বিশেষ করে ভক্তের উচিত কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করা। তাঁর কর্তব্য কেবল ভগবানের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করা। ভগবানকে শস্য, শাক-সবজি, ফল, ফুল এবং দুধ দিয়ে তৈরি নির্দোষ আহার নিবেদন করা হয়, এবং তাই রাজসিক এবং তামসিক খাদ্য তাঁকে নিবেদন করার সম্ভাবনা থাকে না। ভক্তের কখনও লোভী হওয়া উচিত নয়। এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভক্তের *মুনি* বা চিন্তাশীল হওয়া উচিত। তাঁর কর্তব্য সর্বদাই কৃষ্ণের কথা চিন্তা করা এবং কিভাবে আরও ভালভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা যায়, সেই কথা চিন্তা করা। সেইটিই তাঁর একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত। জড়বাদীরা যেমন সর্বদাই তাদের জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের কথা চিন্তা করে, ভক্তের উচিত তেমনই সর্বদাই কৃষ্ণভক্তিতে তাঁর অবস্থার উন্নতি সাধনের চিন্তায় মগ্ন থাকা; তাই ভক্তের *মুনি* হওয়া উচিত।

পরবর্তী বিষয়টি হচ্ছে ভক্তের নির্জন স্থানে বাস করা উচিত। সাধারণত বিষয়ী ব্যক্তিরা তাদের জাগতিক উন্নতি সাধনে অত্যন্ত আগ্রহী, যা ভক্তের কাছে নিষ্প্রয়োজন। ভক্তের উচিত এমন স্থানে বাস করা যেখানে সকলেই ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে আগ্রহী। তাই সাধারণত ভক্ত তীর্থস্থানে যান, যেখানে ভগবদ্ভক্তেরা বাস করেন। এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভক্তের এমন স্থানে বাস করা উচিত যেখানে অধিক সংখ্যক সাধারণ মানুষ নেই। নির্জন স্থানে *(বিবিক্তশরণঃ)* বাস করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার পরের বিষয়টি হচ্ছে *শান্ত*। ভগবদ্ভক্তের ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়। সহজ উপায়ে তিনি যা উপার্জন করেন, তা নিয়ে তাঁর সন্তুষ্ট থাকা উচিত, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই কেবল আহার করা উচিত, নির্জন স্থানে বাস করা উচিত এবং সর্বদা প্রশান্ত চিত্ত হওয়া উচিত। কৃষ্ণভক্তি সম্পাদন করার জন্য মনের শান্তি প্রয়োজন।

তার পরের বিষয়টি হচ্ছে মৈত্র। ভক্তের উচিত সকলের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন হওয়া, তবে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব কেবল ভক্তদের সঙ্গেই হওয়া উচিত। অন্যদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার কেবল কার্য সাধনের জন্যই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু হওয়া উচিত। তিনি বলতে পারেন, "হ্যাঁ, মহাশয়, আপনি যা বলছেন তা ঠিক," কিন্তু তাদের সঙ্গে তাঁর কোন ঘনিষ্ঠতা নেই। তবে যারা সরল চিত্ত, অর্থাৎ যারা নাস্তিক নয় অথবা পারমার্থিক উপলব্ধিতেও ততটা উন্নত নয়, তাদের প্রতি তিনি কৃপাপরায়ণ। তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে ভক্ত তাদের কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য উপদেশ দেন। ভগবদ্ভক্তের সব সময় *আত্মবান্* বা চিন্ময় অবস্থায় অধিষ্ঠিত থাকা উচিত। তাঁর কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তাঁর প্রধান

উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে বা কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করা, এবং মূর্খতাবশত দেহ অথবা মনকে স্বরূপ বলে মনে করা উচিত নয়। *আত্মা* মানে হচ্ছে দেহ অথবা মন, কিন্তু এখানে *আত্মবান্* শব্দটির বিশেষ অর্থ হচ্ছে আত্ম উপলব্ধ হওয়া। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সর্বদাই শুদ্ধ চেতনায় থাকা অর্থাৎ তিনি যে তাঁর জড় দেহ অথবা মন নন, তাঁর প্রকৃত স্বরূপে তিনি যে চিন্ময় আত্মা, সেই সম্বন্ধে সচেতন থাকা। তার ফলেই তিনি দৃঢ় নিশ্চিতভাবে কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করবেন।

## শ্লোক ৯

**সানুবন্ধে চ দেহেঽস্মিন্নকুর্বন্নসদাগ্রহম্ ।**
**জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ ॥ ৯ ॥**

**স-অনুবন্ধে**—দেহের সম্বন্ধে; **চ**—এবং; **দেহে**—দেহের প্রতি; **অস্মিন্**—এই; **অকুর্বন্**—না করে; **অসৎ-আগ্রহম্**—দেহকে নিজের প্রকৃত পরিচয় বলে মনে করা; **জ্ঞানেন**—জ্ঞানের দ্বারা; **দৃষ্ট**—দর্শন করে; **তত্ত্বেন**—বাস্তব; **প্রকৃতেঃ**—জড়ের; **পুরুষস্য**—চেতনের; **চ**—এবং।

### অনুবাদ

**মানুষের কর্তব্য হচ্ছে চেতন এবং জড়ের জ্ঞানের দ্বারা দর্শন-শক্তি বৃদ্ধি করা। অনর্থক জড় দেহটিকে স্বরূপ বলে মনে করা উচিত নয় এবং তার ফলে দেহের সম্পর্কের প্রতি অনুরক্ত হওয়া উচিত নয়।**

### তাৎপর্য

বদ্ধ জীবেরা তাদের দেহের পরিচয়ে পরিচিত হতে উৎসুক, এবং তারা মনে করে যে, তাদের দেহ হচ্ছে 'আমি' এবং দেহের সম্পর্কে যা কিছু এবং দেহের অধিকারে যা কিছু তা সবই 'আমার'। সংস্কৃত ভাষায় তাকে বলা হয় অহং মমত্ব, এবং তাই হচ্ছে বদ্ধ জীবনের মূল কারণ। মানুষের উচিত জড় এবং চেতনের সমন্বয়রূপে সব কিছু দর্শন করা। তার উচিত জড়ের প্রকৃতি এবং চেতনের প্রকৃতির পার্থক্য নিরূপণ করা, এবং তার প্রকৃত পরিচয় আত্মার সম্পর্কে হওয়া উচিত, জড়ের সম্পর্কে নয়। এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষের ভ্রান্ত দেহাত্ম-বুদ্ধি থেকে মুক্ত হওয়া উচিত।

## শ্লোক ১০

**নিবৃত্তবুদ্ধ্যবস্থানো দূরীভূতান্যদর্শনঃ ।**
**উপলভ্যাত্মনাত্মানং চক্ষুষেবার্কমাত্মদৃক্ ॥ ১০ ॥**

**নিবৃত্ত**—অতিক্রম করে; **বুদ্ধি-অবস্থানঃ**—জড় চেতনার স্তর; **দূরী-ভূত**—দূরে; **অন্য**—অন্য; **দর্শনঃ**—জীবনের ধারণা; **উপলভ্য**—উপলব্ধি করে; **আত্মনা**—বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **চক্ষুষা**—চক্ষুর দ্বারা; **ইব**—সদৃশ; **অর্কম্**—সূর্য; **আত্ম-দৃক্**—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা।

### অনুবাদ

**জড় চেতনার উর্ধ্বে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত, এবং জীবনের অন্য সমস্ত ধারণা থেকে মুক্ত থাকা উচিত। এইভাবে অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়ে, আকাশে যেমন সূর্যকে দর্শন করা যায়, ঠিক সেইভাবে আত্মাকে দর্শন করা উচিত।**

### তাৎপর্য

জড়-জাগতিক জীবনে চেতনা তিনটি স্তরে কার্য করে। আমরা যখন জাগ্রত থাকি, তখন চেতনা এক বিশেষভাবে কার্য করে, আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি, তখন তা আর একভাবে কার্য করে, এবং আমরা যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকি, তখন চেতনা আর একভাবে কার্য করে। কৃষ্ণভাবনাময় হতে হলে, চেতনার এই তিনটি স্তরই অতিক্রম করতে হয়। আমাদের বর্তমান চেতনা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চেতনার অতিরিক্ত জীবনের অন্য সমস্ত ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। তাকে বলা হয় *দূরীভূতান্যদর্শনঃ*, অর্থাৎ কেউ যখন পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য আর কিছু দর্শন করেন না। *চৈতন্য-চরিতামৃতে* বলা হয়েছে যে, ভক্ত স্থাবর এবং জঙ্গম বিভিন্ন বস্তু দর্শন করতে পারেন, কিন্তু সব কিছুতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের শক্তিকে ক্রিয়া করতে দেখেন। তিনি যখনই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিকে স্মরণ করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর সবিশেষরূপে স্মরণ করেন। তাই তাঁর সমস্ত দর্শনে তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) উল্লেখ করা হয়েছে যে, কারও চক্ষু যখন কৃষ্ণপ্রেমের দ্বারা রঞ্জিত হয় *(প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত)*, তিনি তখন সর্বদা বাইরে এবং অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। এখানেও সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে; অন্য সমস্ত দর্শন থেকে মুক্ত হতে হবে, এবং তখন তিনি তাঁর অহঙ্কারজনিত ভ্রান্ত পরিচিতি থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের

নিত্য দাসরূপে নিজেকে দর্শন করতে পারবেন। *চক্ষুষেবার্কম্*—আমরা যেমন নিঃসন্দেহে সূর্যকে দর্শন করতে পারি, তেমন যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনামৃত বিকশিত করেছেন, তিনিও শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শক্তিকেও ঠিক সেইভাবে দর্শন করতে পারেন। এই দর্শনের দ্বারা জীব *আত্মদৃক্* বা আত্ম-তত্ত্ববেত্তা হন। যখন দেহাত্ম-বুদ্ধির অহঙ্কার বিদূরিত হয়, তখন প্রকৃত দৃষ্টি প্রকাশিত হয়। তাই তখন ইন্দ্রিয়গুলিও নির্মল হয়। ভগবানের প্রকৃত সেবা তখনই শুরু হয়, যখন ইন্দ্রিয়গুলি নির্মল হয়। ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না, পরন্তু দেহাত্ম-বুদ্ধির অহঙ্কার দূর করতে হয়। তখন ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই নির্মল হয়ে যায়, এবং নির্মল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাস্তবিক পক্ষে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা যায়।

## শ্লোক ১১

**মুক্তলিঙ্গং সদাভাসমসতি প্রতিপদ্যতে ।**
**সতো বন্ধুমসচ্চক্ষুঃ সর্বানুস্যূতমদ্বয়ম্ ॥ ১১ ॥**

**মুক্ত-লিঙ্গম্**—অধোক্ষজ; **সৎ-আভাসম্**—প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত; **অসতি**—অহঙ্কারে; **প্রতিপদ্যতে**—উপলব্ধি করে; **সতঃ বন্ধুম্**—জড় কারণের আশ্রয়; **অসৎ-চক্ষুঃ**—মায়ার চক্ষু (প্রকাশকারী); **সর্ব-অনুস্যূতম্**—সব কিছুতে প্রবিষ্ট; **অদ্বয়ম্**—অদ্বিতীয়।

## অনুবাদ

**অধোক্ষজ এবং অহঙ্কারেও প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত পরমেশ্বর ভগবানকে মুক্ত জীব উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি জড় কারণের আশ্রয় এবং তিনি সব কিছুতে প্রবিষ্ট হয়েছেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব, এবং তিনি মায়ার চক্ষু।**

## তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত সমস্ত জড় প্রকাশে পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতি দর্শন করতে পারেন। ভগবান জড় জগতেই কেবল প্রতিবিম্বরূপে বিরাজ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও শুদ্ধ ভক্ত উপলব্ধি করতে পারেন যে, মায়ার অন্ধকারে একমাত্র আলোক হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তার আশ্রয়। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, জড় সৃষ্টির পটভূমি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। *ব্রহ্মসংহিতাতে* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। *ব্রহ্মসংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অংশ এবং কলা বিস্তারের দ্বারা, কেবল এই ব্রহ্মাণ্ড এবং অন্যান্য

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেই নয়, প্রতিটি পরমাণুতেও বিরাজমান, যদিও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। এই শ্লোকে যে অদ্বয়ম্—'অদ্বিতীয়,' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান যদিও সব কিছুতে উপস্থিত, এমন কি পরমাণুতেও পর্যন্ত, তবুও তিনি অবিভাজ্য। প্রত্যেক বস্তুতে তাঁর উপস্থিতি পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

## শ্লোক ১২

**যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে ।**
**স্বাভাসেন তথা সূর্যো জলস্থেন দিবি স্থিতঃ ॥ ১২ ॥**

**যথা**—যেমন; **জল-স্থঃ**—জলে স্থিত; **আভাসঃ**—প্রতিবিম্ব; **স্থল-স্থেন**—দেওয়ালে অবস্থিত; **অবদৃশ্যতে**—দেখা যায়; **স্ব-আভাসেন**—তার প্রতিবিম্বের দ্বারা; **তথা**—সেইভাবে; **সূর্যঃ**—সূর্য; **জল-স্থেন**—জলে স্থিত; **দিবি**—আকাশে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত।

### অনুবাদ

**সূর্য আকাশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যেমন প্রথমে জলে প্রতিবিম্বরূপে, এবং ঘরের দেওয়ালে দ্বিতীয় প্রতিবিম্বরূপে সূর্যকে উপলব্ধি করা যায়, ঠিক সেইভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়।**

### তাৎপর্য

এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা খুবই সুন্দর হয়েছে। সূর্য পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বহু দূরে আকাশে অবস্থিত কিন্তু তা সত্ত্বেও তার প্রতিবিম্ব ঘরের কোণে একটি জলপূর্ণ পাত্রে দেখা যায়। ঘরটি অন্ধকার, এবং সূর্য বহু দূরে আকাশে রয়েছে, কিন্তু জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব অন্ধকার ঘরটিকে আলোকিত করে। শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের শক্তির প্রতিবিম্বের দ্বারা সব কিছুর মধ্যে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন। *বিষ্ণু পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাপ এবং আলোকের দ্বারা যেমন অগ্নির উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়, ঠিক তেমনই পরমেশ্বর ভগবান এক এবং অদ্বিতীয় হলেও, তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে সব কিছুতেই তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। *ঈশোপনিষদে* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, মুক্তাত্মারা সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করেন, ঠিক যেমন সূর্য পৃথিবী থেকে বহু দূরে অবস্থিত হলেও সূর্য-কিরণ এবং তার প্রতিবিম্ব সর্বত্র দর্শন করা যায়।

## শ্লোক ১৩

এবং ত্রিবৃদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ ।
স্বাভাসৈর্লক্ষিতোঽনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্ ॥ ১৩ ॥

**এবম্**—এইভাবে; **ত্রি-বৃৎ**—ত্রিবিধ; **অহঙ্কারঃ**—অহঙ্কার; **ভূত-ইন্দ্রিয়-মনঃ-ময়ৈঃ**—দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন-সমন্বিত; **স্ব-আভাসৈঃ**—তার নিজের প্রতিবিম্বের দ্বারা; **লক্ষিতঃ**—প্রকাশিত; **অনেন**—এর দ্বারা; **সৎ-আভাসেন**—ব্রহ্মের প্রতিফলনের দ্বারা; **সত্য-দৃক্**—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা।

### অনুবাদ

**তত্ত্বদ্রষ্টা আত্মা এইভাবে প্রথমে ত্রিবিধ অহঙ্কারে এবং তার পর দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনে প্রতিবিম্বিত হয়।**

### তাৎপর্য

বদ্ধ জীব মনে করে, "আমি এই দেহ," কিন্তু মুক্ত জীব মনে করেন, "আমি এই দেহ নই। আমি চিন্ময় আত্মা।" এই 'আমি'-কে বলা হয় অহঙ্কার, বা নিজের পরিচিতি। 'আমি এই শরীর' অথবা 'আমার শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু আমার'—এই মনোভাবকে বলা হয় অহঙ্কার, কিন্তু কেউ যখন তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন, এবং মনে করেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাস, সেই পরিচিতিটি হচ্ছে প্রকৃত অহঙ্কার। একটি ধারণা জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণের প্রভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন, এবং অপরটি হচ্ছে সত্ত্বগুণের শুদ্ধ অবস্থা, যাকে বলা হয় শুদ্ধ সত্ত্ব বা বাসুদেব। যখন আমরা অহঙ্কার ত্যাগ করার কথা বলি, তার অর্থ হচ্ছে যে, আমরা আমাদের ভ্রান্ত পরিচয় পরিত্যাগ করি, কিন্তু আমাদের প্রকৃত স্বরূপ সর্বদাই রয়েছে। অহঙ্কারের প্রভাবে দেহ এবং মনের জড় কলুষের মাধ্যমে যখন জীবের সত্তা প্রতিবিম্বিত হয়, তখন তাকে বলা হয় বদ্ধ অবস্থা, কিন্তু তা যখন শুদ্ধ স্তরে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন তাকে বলা হয় মুক্ত অবস্থা। বদ্ধ অবস্থায় জড় সম্পদের মাধ্যমে নিজের যে পরিচিতি তা অবশ্যই সংশোধন করতে হবে, এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে নিজেকে চিনতে হবে। বদ্ধ অবস্থায় মানুষ সব কিছুকেই তার ইন্দ্রিয় সুখভোগের বস্তু বলে মনে করে, কিন্তু মুক্ত অবস্থায় মানুষ সব কিছুই ভগবানের সেবার সামগ্রীরূপে

গ্রহণ করেন। কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে জীবের প্রকৃত মুক্ত অবস্থা। অন্যথায়, জড় স্তরের সঙ্কল্প-বিকল্প, অথবা শূন্যবাদ বা নির্বিশেষবাদ—এ সবই শুদ্ধ আত্মার কলুষিত অবস্থা।

*সত্যদৃক্* নামক বিশুদ্ধ আত্মাকে জানার দ্বারা সব কিছুকেই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিবিম্বরূপে দর্শন করা যায়। এই সম্পর্কে একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বদ্ধ জীব একটি সুন্দর গোলাপ ফুল দেখে, সেই সুগন্ধি পুষ্পটিকে তার নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ব্যবহার করতে চায়। এইটি এক প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু, একজন মুক্ত আত্মা সেই ফুলটিকে ভগবানের প্রতিবিম্বরূপে দর্শন করেন। তিনি মনে করেন, "এই সুন্দর ফুলটি সম্ভব হয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের পরা শক্তির প্রভাবে; অতএব এইটি ভগবানের, এবং তাঁর সেবাতেই এইটির উপযোগ করা উচিত।" এই দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বদ্ধ জীব ফুলটিকে তার ইন্দ্রিয় সুখভোগের উদ্দেশ্যে দর্শন করে, এবং ভগবদ্ভক্ত সেই ফুলটিকে ভগবানের সেবায় ব্যবহারের উপযোগী বলে দর্শন করেন। এইভাবে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিবিম্ব তার নিজের ইন্দ্রিয়ে, মনে এবং দেহে—সব কিছুতে দর্শন করতে পারে। এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষ সব কিছুকেই ভগবানের সেবায় লাগাতে পারে। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি তাঁর সব কিছু—তাঁর প্রাণ, তাঁর বিত্ত, তাঁর বুদ্ধি, তাঁর বাণী ভগবানের সেবায় যুক্ত করেছেন, অথবা যিনি এই সব কিছু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে চান, তিনি যেই অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁকে মুক্ত আত্মা বা *সত্যদৃক্* বলে বিবেচনা করতে হবে। এই প্রকার মানুষ যথাযথ উপলব্ধি লাভ করেছেন।

## শ্লোক ১৪

**ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিষ্বিহ নিদ্রয়া ।**
**লীনেষ্বসতি যস্তত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥**

**ভূত**—জড় উপাদানসমূহ; **সূক্ষ্ম**—ভোগের বিষয়সমূহ; **ইন্দ্রিয়**—জড় ইন্দ্রিয়; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **আদিষু**—ইত্যাদি; **ইহ**—এখানে; **নিদ্রয়া**—নিদ্রার দ্বারা; **লীনেষু**—লীন; **অসতি**—অপ্রকটে; **যঃ**—যিনি; **তত্র**—সেখানে; **বিনিদ্রঃ**—জাগ্রত; **নিরহংক্রিয়ঃ**—অহঙ্কার থেকে মুক্ত।

## অনুবাদ

**যদিও মনে হয় যে ভক্ত পঞ্চভূতে, ভোগের বিষয়ে, জড় ইন্দ্রিয়ে এবং মন ও বুদ্ধিতে লীন হয়ে রয়েছেন, তবুও বুঝতে হবে যে তিনি জাগ্রত, এবং অহঙ্কার থেকে মুক্ত।**

## তাৎপর্য

*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামীর ব্যাখ্যা, জীব কিভাবে এই শরীরে থাকা সত্ত্বেও মুক্ত হতে পারে, তা এই শ্লোকে আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। যে জীব *সত্যদৃক্*, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে নিজের পরিচয় উপলব্ধি করেছেন, তিনি আপাত দৃষ্টিতে পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধিতে লীন হয়ে রয়েছেন বলে মনে হলেও তাঁকে জাগ্রত এবং অহঙ্কারের সমস্ত প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত বলে মনে করতে হবে। এখানে *লীন* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মায়াবাদীরা বলে যে, ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়াই হচ্ছে তাদের চরম লক্ষ্য। সেই লীন হয়ে যাওয়ার কথা এখানেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু লীন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও জীব তার সত্তা বজায় রাখতে পারে। সেই সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, একটি সবুজ পাখি যখন একটি সবুজ গাছে প্রবেশ করে, তখন মনে হয় যেন গাছের সবুজ রঙের সঙ্গে সেই পাখিটি লীন হয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পাখিটি তার সত্তা হারিয়ে ফেলে না। তেমনই, জড়া প্রকৃতি অথবা পরা প্রকৃতিতে লীন প্রাপ্ত জীব তার সত্তা ত্যাগ করে না। জীবের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাস বলে বুঝতে পারা। সেই তত্ত্বটি আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। শ্রীকৃষ্ণও *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন করেছেন যে, জীব হচ্ছে তাঁর শাশ্বত অংশ। অংশের কর্তব্য হচ্ছে পূর্ণের সেবা করা। সেটিই হচ্ছে স্বাতন্ত্র্য। এই জড় জগতেও জীব যখন আপাত দৃষ্টিতে জড়ের মধ্যে লীন হয়ে থাকে, তখনও তার সেই স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। তার স্থূল দেহ পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা গঠিত, তার সূক্ষ্ম দেহটি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং কলুষিত চেতনার দ্বারা গঠিত, এবং তার পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় রয়েছে। এইভাবে জীব জড়ের মধ্যে লীন হয়ে থাকে। কিন্তু জড় জগতের এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বে লীন হয়ে থাকার সময়েও, ভগবানের নিত্য দাসরূপে সে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। পরা প্রকৃতিতেই হোক অথবা জড়া প্রকৃতিতেই হোক, ভগবানের এই প্রকার

সেবককে মুক্ত আত্মা বলে বিবেচনা করতে হবে। সেটিই হচ্ছে মহাজনদের সিদ্ধান্ত, এবং এই শ্লোকেও তা প্রতিপন্ন হয়েছে।

## শ্লোক ১৫

**মন্যমানস্তদাত্মানমনষ্টো নষ্টবন্মৃষা ।**
**নষ্টেঽহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ ॥ ১৫ ॥**

**মন্যমানঃ**—মনে করে; **তদা**—তখন; **আত্মানম্**—নিজেকে; **অনষ্টঃ**—নষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও; **নষ্ট-বৎ**—নষ্টের মতো; **মৃষা**—ভ্রান্তভাবে; **নষ্টে অহঙ্করণে**—অহঙ্কার বিনষ্ট হওয়ার ফলে; **দ্রষ্টা**—দর্শক; **নষ্ট-বিত্তঃ**—যে তার সম্পদ হারিয়েছে; **ইব**—মতো; **আতুরঃ**—দুর্দশাগ্রস্ত।

### অনুবাদ

**জীব দ্রষ্টারূপে স্পষ্টভাবে তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু গভীর নিদ্রার সময় তার অহঙ্কার দূর হয়ে যাওয়ার ফলে, সে ভ্রান্তভাবে মনে করে যে, সে নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক যেমন ধন-সম্পদ হারাবার ফলে মানুষ গভীর দুঃখে অভিভূত হয়, এবং মনে করে যে, সে নিজেও নষ্ট হয়ে গেছে।**

### তাৎপর্য

অজ্ঞানতার বশেই কেবল জীব মনে করে যে, সে নষ্ট হয়ে গেছে। যদি জ্ঞানের প্রভাবে সে তার শাশ্বত অস্তিত্বের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে, সে নষ্ট হয়ে যায়নি। এখানে তার একটি উপযুক্ত উদাহরণ দেওয়া হয়েছে—*নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ*। যে ব্যক্তি বিপুল ধন-সম্পদ হারিয়েছে, সে মনে করতে পারে যে, সে নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে নষ্ট হয় না—কেবল তার ধন-সম্পদ নষ্ট হয়। কিন্তু ধন-সম্পদের চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে অথবা ধন-সম্পদের প্রতি মমত্ববোধের ফলে, সে মনে করে যে, সে নষ্ট হয়ে গেছে। তেমনই যখন ভ্রান্তভাবে জড় অবস্থাকে আমাদের কার্যের কর্মক্ষেত্র বলে মনে করি, তখন আমাদের মনে হয় যে, আমরা নষ্ট হয়ে গেছি, যদিও প্রকৃত পক্ষে আমরা নষ্ট হই না। মানুষ যখন শুদ্ধ জ্ঞানে জাগরিত হয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, সে হচ্ছে ভগবানের নিত্য দাস, তখন তার বাস্তবিক স্থিতি পুনর্জাগরিত

হয়। জীব কখনও নষ্ট হয় না। কেউ যখন গভীর নিদ্রায় তার পরিচয় ভুলে যায়, তখন সে স্বপ্নে মগ্ন হয়, এবং তখন সে নিজেকে অন্য একজন ভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করতে পারে অথবা নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তার পরিচয় সম্পূর্ণরূপে অক্ষত থাকে। অহঙ্কারের ফলেই নষ্ট হয়ে যাওয়ার এই ধারণা হয়, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না জীব ভগবানের নিত্য দাসরূপে নিজেকে জানবার চেতনায় জাগরিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত থাকে। মায়াবাদীদের ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার যে ধারণা তা অহঙ্কারে নষ্ট হওয়ার আর একটি লক্ষণ। ভ্রান্তিবশত কেউ দাবি করতে পারে যে, সে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে তা নয়। জীবের উপর মায়ার প্রভাবের এটিই হচ্ছে চরম ফাঁদ। অহঙ্কারের ফলেই মানুষ নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের সমান বলে মনে করে অথবা সে ভগবান হয়ে গেছে বলে মনে করে।

## শ্লোক ১৬

**এবং প্রত্যবমৃশ্যাসাবাত্মানং প্রতিপদ্যতে ।**
**সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য যোঽবস্থানমনুগ্রহঃ ॥ ১৬ ॥**

**এবম্**—এইভাবে; **প্রত্যবমৃশ্য**—বোঝার পর; **অসৌ**—সেই ব্যক্তি; **আত্মানম্**—নিজেকে; **প্রতিপদ্যতে**—উপলব্ধি করে; **স-অহঙ্কারস্য**—অহঙ্কারের প্রভাবে গৃহীত; **দ্রব্যস্য**—অবস্থার; **যঃ**—যিনি; **অবস্থানম্**—আশ্রয়; **অনুগ্রহঃ**—প্রকাশক।

## অনুবাদ

**কোন ব্যক্তি যখন তাঁর পরিপক্ক জ্ঞানের দ্বারা তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে উপলব্ধি করতে পারেন, তখন অহঙ্কারের প্রভাবে তিনি যে অবস্থা স্বীকার করেছেন তা তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়।**

## তাৎপর্য

মায়াবাদী দার্শনিকদের ধারণা হচ্ছে যে, চরমে স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়ে যায়, এবং তখন সব কিছু এক হয়ে যায়। তাদের মতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানের মধ্যে কোন

পার্থক্য নেই। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচারের দ্বারা আমরা দেখতে পাই যে, তা ঠিক নয়। এমন কি কেউ যদি মনে করে যে, তিনটি বিভিন্ন তত্ত্ব—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান একাকার হয়ে গেছে, তা হলেও স্বাতন্ত্র্য কখনও নষ্ট হয়ে যায় না। তিনের একাকার হয়ে যাওয়ার যে ধারণা সেটিও এক প্রকার জ্ঞান, এবং যেহেতু সেই জ্ঞানের জ্ঞাতার অস্তিত্ব তখনও রয়েছে, তা হলে কিভাবে বলা যায় যে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান এক হয়ে গেছে? সেই জ্ঞান উপলব্ধি করছেন যে স্বতন্ত্র জীবাত্মা, তাঁর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তিনি তখনও রয়েছেন। জড় অস্তিত্ব এবং চিন্ময় অস্তিত্ব, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিসত্তা বর্তমান থাকে, তবে তাদের পার্থক্য কেবল পরিচিতিতে। জড় পরিচয়ের ক্ষেত্রে অহঙ্কার কার্য করে, এবং সেই ভ্রান্ত পরিচিতির ফলে, জীব বস্তুকে তার প্রকৃতরূপে গ্রহণ না করে ভিন্নরূপে গ্রহণ করে। সেইটি বদ্ধ জীবনের মূল কারণ। তেমনই, অহঙ্কার যখন শুদ্ধ হয়, তখন জীব সব কিছুই সঠিকভাবে গ্রহণ করে। সেইটি হচ্ছে মুক্ত অবস্থা।

*ঈশোপনিষদে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, সব কিছুই ভগবানের। *ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্*। সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিতে অস্তিত্বশীল। *ভগবদ্গীতাতে* তা প্রতিপন্ন হয়েছে। যেহেতু সব কিছুই ভগবানের শক্তি থেকে উদ্ভূত এবং ভগবানের শক্তিতে বিরাজ করছে, শক্তি তাঁর থেকে ভিন্ন নয়—কিন্তু তবুও ভগবান ঘোষণা করেছেন, "আমি সেখানে নেই।" কেউ যখন স্পষ্টভাবে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করেন, তখন সব কিছুই প্রকাশিত হয়। অহঙ্কারের ভিত্তিতে যখন বস্তুকে গ্রহণ করা হয়, তখন সেইটি হচ্ছে জীবের বদ্ধ অবস্থা, কিন্তু সব কিছু যখন সঠিকভাবে গ্রহণ করা হয়, তখন মুক্তি লাভ হয়। পূর্ববর্তী শ্লোকে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে, তা এখানে প্রযোজ্য—নিজের ধন-সম্পদে নিজের পরিচিতি আরোপ করার ফলে, মানুষ যখন সেই ধন-সম্পদে মগ্ন হয়ে থাকে, তখন সেই ধন নষ্ট হয়ে গেলে, সে মনে করে যে, সেও নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তার ধন-সম্পদ তার প্রকৃত পরিচয় নয়, এমন কি সেই ধন-সম্পদ তারও নয়। যখন প্রকৃত অবস্থাটি হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, ধন-সম্পদ কোন ব্যক্তির বা জীবের নয়, এমন কি তা মানুষের দ্বারাও উৎপন্ন হয়নি। চরমে সমস্ত ধন-সম্পদ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি, এবং তা নষ্ট হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু যতক্ষণ ভ্রান্তিবশত মানুষ মনে করে, "আমি ভোক্তা," অথবা "আমি ভগবান," ততক্ষণ পর্যন্ত জীব বদ্ধ অবস্থায় থাকে। যখনই সেই অহঙ্কার দূর হয়ে যায়, তখন সে মুক্ত হয়ে যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, স্বীয় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়ার নামই হচ্ছে মুক্তি।

## শ্লোক ১৭

দেবহূতিরুবাচ

পুরুষং প্রকৃতির্ব্রহ্মন্ন বিমুঞ্চতি কর্হিচিৎ ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়ত্বাচ্চ নিত্যত্বাদনয়োঃ প্রভো ॥ ১৭ ॥

**দেবহূতিঃ উবাচ**—দেবহূতি বললেন; **পুরুষম্**—আত্মা; **প্রকৃতিঃ**—জড়া প্রকৃতি; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ন**—না; **বিমুঞ্চতি**—মুক্ত করে; **কর্হিচিৎ**—কখনও; **অন্যোন্য**—পরস্পরের প্রতি; **অপাশ্রয়ত্বাৎ**—আকর্ষণ থেকে; **চ**—এবং; **নিত্যত্বাৎ**—নিত্যত্ব থেকে; **অনয়োঃ**—তাদের উভয়ের; **প্রভো**—হে প্রভু।

### অনুবাদ

**শ্রীদেবহূতি জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রাহ্মণ! জড়া প্রকৃতি কি কখনও জীবাত্মাকে মুক্তি দেয়? যেহেতু তাদের পরস্পরের আকর্ষণ নিত্য, তাই তাদের বিচ্ছেদ কিভাবে সম্ভব?**

### তাৎপর্য

কপিলদেবের মাতা দেবহূতি এখানে তাঁর প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন। যদিও মানুষ বুঝতে পারে যে, চেতন আত্মা এবং জড় পদার্থ ভিন্ন, তবুও দার্শনিক অনুমানের দ্বারা অথবা যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা তাদের বাস্তবিকভাবে আলাদা করা সম্ভব নয়। জীবাত্মা হচ্ছে ভগবানের তটস্থা শক্তি, এবং জড়া প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। কোন না কোনভাবে এই দুইটি নিত্য শক্তির সমন্বয় হয়েছে, এবং যেহেতু তাদের পরস্পর থেকে পৃথক করা অত্যন্ত কঠিন, অতএব জীবাত্মার পক্ষে মুক্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব? ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখা যায় যে, আত্মা যখন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন দেহটির কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকে না, এবং দেহ যখন আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন আর আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। আত্মা এবং দেহ যখন সংযুক্ত থাকে, তখন জীবন রয়েছে বলে বোঝা যায়। কিন্তু তারা যখন আলাদা হয়ে যায়, তখন আর দেহ অথব আত্মার অস্তিত্বের প্রকাশ থাকে না। কপিলদেবের কাছে দেবহূতির এই প্রশ্ন অনেকটা শূন্যবাদ দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। শূন্যবাদীরা বলে যে, চেতনা জড় পদার্থের সমন্বয় থেকে উদ্ভূত, এবং চেতনা যখন চলে যায়, তখন জড় পদার্থের সেই সমন্বয় দ্রবীভূত হয়ে যায়, এবং তাই চরমে শূন্য ছাড়া আর কিছু নেই চেতনার এই অনুপস্থিতিকে মায়াবাদ দর্শনে *নির্বাণ* বলা হয়।

## শ্লোক ১৮

**যথা গন্ধস্য ভূমেশ্চ ন ভাবো ব্যতিরেকতঃ ।**
**অপাং রসস্য চ যথা তথা বুদ্ধেঃ পরস্য চ ॥ ১৮ ॥**

**যথা**—যেমন; **গন্ধস্য**—গন্ধের; **ভূমেঃ**—মাটির; **চ**—এবং; **ন**—না; **ভাবঃ**—অস্তিত্ব; **ব্যতিরেকতঃ**— পৃথক; **অপাম্**—জলের; **রসস্য**—রসের; **চ**—এবং; **যথা**—যেমন; **তথা**—তেমন; **বুদ্ধেঃ**—বুদ্ধির; **পরস্য**—চেতনার, আত্মার; **চ**—এবং।

### অনুবাদ

**পৃথিবী এবং গন্ধের অথবা জল এবং রসের যেমন পরস্পর থেকে পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনই বুদ্ধি এবং চেতনার পরস্পর থেকে পৃথক কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না।**

### তাৎপর্য

এখানে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত জড় পদার্থের গন্ধ রয়েছে। ফুল, পৃথিবী—সব কিছুরই গন্ধ রয়েছে। কোন বস্তু থেকে যদি তার গন্ধ আলাদা করে দেওয়া হয়, তা হলে সেই বস্তুটিকে আর চেনা যায় না। জলের যদি স্বাদ না থাকে, তা হলে সেই জলের কোন অর্থই থাকে না; আগুনের যদি তাপ না থাকে, তা হলে সেই আগুনের কোন অর্থ থাকে না। তেমনই, যদি বুদ্ধি না থাকে, তা হলে সেই আত্মার অস্তিত্ব অর্থহীন।

## শ্লোক ১৯

**অকর্তুঃ কর্মবন্ধোঽয়ং পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ ।**
**গুণেষু সৎসু প্রকৃতেঃ কৈবল্যং তেষতঃ কথম্ ॥ ১৯ ॥**

**অকর্তুঃ**—নিষ্ক্রিয় কর্তা, অকর্তা; **কর্ম-বন্ধঃ**—সকাম কর্মের বন্ধন; **অয়ম্**—এই; **পুরুষস্য**—আত্মার; **যৎ-আশ্রয়ঃ**—গুণের প্রতি আসক্তির ফলে; **গুণেষু**—যখন গুণের মধ্যে থাকে; **সৎসু**—বর্তমান থাকে; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **কৈবল্যম্**—মুক্তি; **তেষু**—তাদের; **অতঃ**—অতএব; **কথম্**—কিভাবে।

## অনুবাদ

**অতএব, সমস্ত কর্মের নিষ্ক্রিয় অনুষ্ঠাতা হলেও, যতক্ষণ পর্যন্ত জড়া প্রকৃতি তার উপর তার প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে বেঁধে রাখে, ততক্ষণ তার পক্ষে মুক্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব?**

## তাৎপর্য

জীব যদিও জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত হতে চায়, তবুও তাকে মুক্তি দেওয়া হয় না। প্রকৃত পক্ষে, জীব যখনই জড়া প্রকৃতির গুণের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, তখন থেকেই তার সমস্ত কার্যকলাপ প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং সে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। *ভগবদ্গীতায়* সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ*—জীব জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে কার্য করে। ভ্রান্তভাবে জীব মনে করে যে, সে কর্ম করছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে নিষ্ক্রিয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তার জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, কেননা তা তাকে ইতিমধ্যেই বেঁধে রেখেছে। *ভগবদ্গীতাতেও* উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। মানুষ বিভিন্নভাবে চিন্তা করতে পারে যে, চরমে সব কিছুই শূন্য, ভগবান বলে কেউ নেই, আর সব কিছুর পটভূমিতে যদি আত্মা থেকেও থাকে, তা হলে তা নির্বিশেষ। মানুষ এইভাবে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা করতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। দেবহূতি প্রশ্ন করেছেন যে, যদিও মানুষ নানাভাবে জল্পনা-কল্পনা করতে পারে, কিন্তু সে যতক্ষণ জড়া প্রকৃতির প্রভাবে আচ্ছন্ন, ততক্ষণ তার পক্ষে মুক্তি লাভ করা কি সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরও *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) পাওয়া যায়—কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে উৎসর্গ করেন, *(মামেব যে প্রপদ্যন্তে)* তখনই কেবল মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

যেহেতু দেবহূতি ধীরে ধীরে শরণাগতির পর্যায়ে আসছেন, তাই তাঁর প্রশ্নগুলি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ। জীব কিভাবে মুক্ত হতে পারে? জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জড়া প্রকৃতির গুণের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ, ততক্ষণ তার পক্ষে শুদ্ধ চিন্ময় অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব? এইটি মিথ্যা ধ্যানকারীদেরও ইঙ্গিত করে। তথাকথিত বহু ধ্যানযোগী রয়েছে যারা মনে করে, "আমি পরমাত্মা। আমি জড়া প্রকৃতির সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালনা করছি। আমার পরিচালনায় সূর্য বিচরণ করছে এবং চন্দ্রের উদয় হচ্ছে।" তারা মনে করে যে, এই প্রকার ধ্যানের ফলে তারা মুক্ত হয়ে যেতে পারবে, কিন্তু দেখা যায় যে, এই প্রকার অর্থহীন ধ্যানের তিন মিনিট

পরেই তারা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কিভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তার এই আড়ম্বরপূর্ণ ধ্যানের পরেই সেই ধ্যানযোগী ধূম্রপান অথবা মদ্যপান করার জন্য পিপাসু হয়ে ওঠে। সে যদিও জড়া প্রকৃতির কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ, তবুও সে মনে করে যে, সে মায়ার বন্ধন থেকে ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে গেছে। দেবহূতির এই প্রশ্ন তাদের জন্য যারা ভ্রান্তভাবে দাবি করে যে, তারাই হচ্ছে সব কিছু, চরমে সব কিছুই শূন্য, এবং পাপ কর্ম বা পুণ্য কর্ম বলে কিছু নেই। এইগুলি সমস্তই নাস্তিকদের সৃষ্ট মতবাদ। প্রকৃত পক্ষে, *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ মতো জীব যতক্ষণ পর্যন্ত না পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়, ততক্ষণ তার পক্ষে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া বা মুক্তি লাভ করার কোন সম্ভাবনা নেই।

## শ্লোক ২০

**ক্বচিৎ তত্ত্বাবমর্শেন নিবৃত্তং ভয়মুল্বণম্ ।**
**অনিবৃত্তনিমিত্তত্বাৎপুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে ॥ ২০ ॥**

**ক্বচিৎ**—কোন বিশেষ অবস্থায়; **তত্ত্ব**—মূল তত্ত্ব; **অবমর্শেন**—বিচার করার দ্বারা; **নিবৃত্তম্**—বিদূরিত হয়; **ভয়ম্**—ভয়; **উল্বণম্**—মহা; **অনিবৃত্ত**—নিবৃত্ত না হওয়ার ফলে; **নিমিত্তত্বাৎ**—কারণের ফলে; **পুনঃ**—আবার; **প্রত্যবতিষ্ঠতে**—আবির্ভূত হয়।

### অনুবাদ

**যদিও মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞান এবং তত্ত্ব বিচারের দ্বারা ভব-বন্ধনের মহাভয় বিদূরিত হয়েও থাকে, কিন্তু তার কারণ নষ্ট না হওয়ায়, পুনরায় সেই ভয় আবির্ভূত হতে পারে।**

### তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার অহঙ্কারের ফলে, জড়া প্রকৃতির অধীনস্থ হওয়াই জীবের সংসার বন্ধনের কারণ। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৭) বর্ণনা করা হয়েছে, *ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন*। জীবের মধ্যে দুই প্রকার প্রবণতা দেখা যায়। একটি হচ্ছে ইচ্ছা, অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনা বা পরমেশ্বর ভগবানের মতো মহান হওয়ার বাসনা। সকলেই চায় এই জড় জগতে সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হতে। দ্বেষ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'মাৎসর্য'। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাৎসর্য পরায়ণ হয়ে মনে করে, "কৃষ্ণ কেন সর্বেসর্বা হবে? আমিও কৃষ্ণের

থেকে কোন অংশে কম নই।" ভগবান হওয়ার বাসনা এবং ভগবানের প্রতি মাৎসর্য—এই দুইটি বিষয় হচ্ছে জীবের ভব-বন্ধনের আদি কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত দার্শনিক, মুক্তিকামী অথবা শূন্যবাদীর সব চাইতে মহান হওয়ার, সব কিছু হওয়ার অথবা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করার ইচ্ছা থাকে, ততক্ষণ ভব-বন্ধনের কারণটি থেকে যায়, এবং তাঁর মুক্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে দেবহূতি বলেছেন, "কেউ তার অস্তিত্বের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে বলতে পারে যে, জ্ঞানের দ্বারা সে মুক্ত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, তার কারণটি যতক্ষণ থেকে যায়, ততক্ষণ সে মুক্ত হতে পারে না।" *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বহু জন্ম-জন্মান্তর এই প্রকার জ্ঞানের চর্চা করার পর, কেউ যখন যথার্থই প্রকৃতিস্থ হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখনই কেবল তাঁর জ্ঞানানুসন্ধান সার্থক হয়। জড় জগতের বন্ধন থেকে তত্ত্বগতভাবে মুক্ত হওয়া এবং যথার্থ মুক্তির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৪) বলা হয়েছে যে, কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির মঙ্গলময় পন্থা পরিত্যাগ করে, কেবল অনুমানের দ্বারা সব কিছু জানতে চায়, তা হলে সে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করছে *(ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে)*। এই প্রকার আসক্তিজনিত প্রচেষ্টার ফলে কেবল পরিশ্রমই হয়; কিন্তু কোন লাভ হয় না। মনোধর্মী জ্ঞানের প্রচেষ্টা কেবল পরিশ্রান্তিতেই পর্যবসিত হয়। সেই সূত্রে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, তুষে আঘাত করার ফলে যেমন তা থেকে চাল পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনই মনোধর্মী জ্ঞানের এই সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে কেউ কখনও জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না, কেননা বন্ধনের কারণটি থেকে যায়। প্রথমেই কারণটির নিবৃত্তি সাধন করতে হয়, এবং তা হলে কার্যটি নিবৃত্ত হয়। সেই কথা পরমেশ্বর ভগবান পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করেছেন।

## শ্লোক ২১

**শ্রীভগবানুবাচ**

**অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্মেণামলাত্মনা ।**
**তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসম্ভৃতয়া চিরম্ ॥ ২১ ॥**

**শ্রী-ভগবান্ উবাচ**—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অনিমিত্ত-নিমিত্তেন**—কর্মফলের প্রত্যাশা না করে; **স্ব-ধর্মেণ**—স্বীয় বর্ণ এবং আশ্রমোচিত ধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা;

**অমল-আত্মনা**—শুদ্ধ মনের দ্বারা; **তীব্রয়া**—ঐকান্তিক; **ময়ি**—আমাকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **চ**—এবং; **শ্রুত**—শ্রবণ করে; **সম্ভৃতয়া**—যুক্ত; **চিরম্**—দীর্ঘ কাল পর্যন্ত।

## অনুবাদ

**পরমেশ্বর ভগবান বললেন—যদি কেউ ঐকান্তিকভাবে আমার সেবা করেন, এবং তার ফলে দীর্ঘ কাল ধরে আমার সম্বন্ধে অথবা আমার কাছ থেকে শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি মুক্তি লাভ করতে পারেন। এইভাবে স্বধর্ম আচরণ করার ফলে, কোন প্রকার কর্মফলের উদ্ভব হবে না, এবং তিনি জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।**

## তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকায় বলেছেন যে, কেবল জড়া প্রকৃতির সঙ্গ প্রভাবেই জীব বদ্ধ হয় না। বদ্ধ জীবনের শুরু হয় কেবল প্রকৃতির গুণের দ্বারা দূষিত হওয়ার ফলে। কেউ যদি পুলিশ বিভাগের সংস্পর্শে থাকে, তার অর্থ এই নয় যে, সে একটি দুর্বৃত্ত। পুলিশ বিভাগ যদিও রয়েছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোন অপরাধজনক কার্য করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে দণ্ডভোগ করতে হয় না। তেমনই, মুক্ত পুরুষেরা জড়া প্রকৃতিতে থাকলেও, তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। এমন কি পরমেশ্বর ভগবানও যখন অবতরণ করেন, তখন আপাত দৃষ্টিতে তিনি জড়া প্রকৃতির সঙ্গ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। মানুষের এমনভাবে আচরণ করা উচিত যে, জড়া প্রকৃতিতে থাকা সত্ত্বেও, তিনি জড়া প্রকৃতির কলুষের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। পদ্মফুল যেমন জলে থাকলেও জলকে স্পর্শ করে না, ভগবান শ্রীকপিলদেব এখানে জীবেদেরও ঠিক সেইভাবে থাকবার কথা বলেছেন *(অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্মেণামলাত্মনা)*।

ঐকান্তিক ভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলে, জীব অনায়াসে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারেন। এই ভগবদ্ভক্তি কিভাবে বিকশিত হয়ে পরিপক্ক হয়, তা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমে শুদ্ধ মনে তার স্বধর্ম অনুষ্ঠান করতে হয়। শুদ্ধ চেতনা মানে হচ্ছে কৃষ্ণচেতনা। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে স্বধর্ম অনুষ্ঠান করতে হয়। নিজের কর্তব্য কর্মের পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন নেই; কেবল কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে আচরণ করতে হয়। কৃষ্ণভাবনাময় কর্তব্যগুলি সম্পাদন করার সময় বিচার করে দেখতে হবে যে, সেই বৃত্তি বা স্বধর্ম আচরণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হচ্ছেন কি না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্য আর এক

জায়গায় বলা হয়েছে, *অনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*—সকলেরই কিছু না কিছু কর্তব্য কর্ম রয়েছে, কিন্তু সেই কর্তব্য কর্মের সিদ্ধি তখনই হবে, যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সেই কর্মের দ্বারা সুপ্রসন্ন হবেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, অর্জুনের ধর্ম ছিল যুদ্ধ করা, এবং তাঁর সেই যুদ্ধ প্রবণতার সার্থকতার পরিচয় হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন যে তিনি যেন যুদ্ধ করেন, এবং তিনি যখন কৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, তখন সেটিই ছিল তাঁর ভক্তিময় কর্তব্যের পূর্ণতা। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন তিনি যুদ্ধ করতে অসম্মত হয়েছিলেন, তখন সেটিই ছিল তাঁর অপূর্ণতা।

কেউ যদি তাঁর জীবন সার্থক করতে চান, তা হলে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে হবে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় আচরণ করা, তা হলে সেই কর্মের কোন ফল উৎপন্ন হবে না *(অনিমিত্তনিমিত্তেন)*। সেই কথা ভগবদ্গীতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মনোঽন্যত্র*—কেবল যজ্ঞের উদ্দেশ্যে বা বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করা উচিত। যজ্ঞের উদ্দেশ্য বা বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্য ব্যতীত যদি কর্ম করা হয়, তা হলে তার ফলে কর্মের বন্ধন উৎপন্ন হয়। কপিল মুনিও এখানে নির্দেশ দিয়েছেন যে, কৃষ্ণভক্তি আচরণের দ্বারা, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিতে ঐকান্তিকভাবে যুক্ত হওয়ার দ্বারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই তীব্র ভক্তিযোগ বিকশিত হয় দীর্ঘ কাল ধরে ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। শ্রবণ এবং কীর্তন হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির সূচনা। ভগবদ্ভক্তের সান্নিধ্যে থেকে তাঁদের কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত আবির্ভাব, লীলা, তিরোভাব, নির্দেশ ইত্যাদি শ্রবণ করতে হয়।

দুই প্রকার শ্রুতি বা শাস্ত্র রয়েছে। তার একটিতে ভগবান নিজে বলেছেন, এবং অন্যটিতে ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ভগবদ্গীতা প্রথম পর্যায়ের এবং শ্রীমদ্ভাগবত পরবর্তী পর্যায়ের। তীব্র ভক্তিযোগে যুক্ত হতে হলে, নির্ভরযোগ্য সূত্রে বার বার এই সমস্ত শাস্ত্র শ্রবণ করতে হয়। এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে, মায়ার কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের বিষয়ে শ্রবণ করার ফলে, প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাব থেকে উৎপন্ন সমস্ত কলুষ থেকে হৃদয় মুক্ত হয়। নিরন্তর, নিয়মিতভাবে শ্রবণ করার ফলে, কাম এবং লোভ বা প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার কলুষিত প্রভাব হ্রাস পায়, এবং এইভাবে কাম এবং লোভ হ্রাস পাওয়ার ফলে, জীব সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়। এটিই হচ্ছে ব্রহ্ম উপলব্ধি বা আত্ম

উপলব্ধির স্তর। এইভাবে জীব চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়। চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়াই হচ্ছে ভব-বন্ধন থেকে মুক্তি।

## শ্লোক ২২

**জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা ।**
**তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা ॥ ২২ ॥**

**জ্ঞানেন**—জ্ঞানে; **দৃষ্ট-তত্ত্বেন**—পরমতত্ত্ব দর্শনের দ্বারা; **বৈরাগ্যেণ**—বৈরাগ্যের দ্বারা; **বলীয়সা**—অত্যন্ত বলবান; **তপঃ-যুক্তেন**—তপস্যায় যুক্ত হওয়ার দ্বারা; **যোগেন**—অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা; **তীব্রেণ**—দৃঢ়ভাবে যুক্ত; **আত্ম-সমাধিনা**—আত্ম সমাধির দ্বারা।

### অনুবাদ

**পূর্ণ জ্ঞান এবং চিন্ময় তত্ত্ব-দর্শন সহকারে দৃঢ়তাপূর্বক এই ভক্তি অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। দৃঢ়তাপূর্বক আত্ম-সমাধিতে মগ্ন হওয়ার জন্য কঠোর বৈরাগ্যযুক্ত হওয়া উচিত এবং তপশ্চর্যা ও অষ্টাঙ্গ যোগ অনুষ্ঠান করা উচিত।**

### তাৎপর্য

জড় আবেগ অথবা মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা অন্তরভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করা যায় না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করার দ্বারা পূর্ণজ্ঞানে ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করতে হয়। দিব্য জ্ঞান বিকশিত করার দ্বারা আমরা পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, এবং এই দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হয় বৈরাগ্যের দ্বারা। এই বৈরাগ্য ক্ষণস্থায়ী বা কৃত্রিম নয়, পক্ষান্তরে তা অত্যন্ত প্রবল। বলা হয় যে, জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্তি বা বৈরাগ্যের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির বিকাশের মাত্রা প্রদর্শিত হয়। কেউ যদি জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্ত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, কৃষ্ণভক্তিতে তার উন্নতি সাধন হচ্ছে না। কৃষ্ণভক্তিতে বৈরাগ্য এতই প্রবল হয় যে, যে-কোন মায়িক আকর্ষণের দ্বারা তাকে বিচ্যুত করা যায় না। মানুষকে পূর্ণ তপস্যা সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করতে হয়। তাঁকে শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ—এই দুইটি একাদশীতে, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরামচন্দ্রের এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে উপবাস করতে হয়। এই রকম অনেক উপবাসের দিন রয়েছে। *যোগেন* মানে হচ্ছে 'ইন্দ্রিয় এবং মনকে নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা'। *যোগ ইন্দ্রিয়সংযমঃ*। *যোগেন* ইঙ্গিত করে

যে, ঐকান্তিকভাবে আত্ম-চেতনায় মগ্ন হয়ে, জ্ঞানের বিকাশের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে, তাঁর নিজের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা। এইভাবে মানুষ ভগবদ্ভক্তিতে স্থির হয়, এবং তখন আর তাঁর শ্রদ্ধা কোন রকম জড় প্রলোভনের দ্বারা বিচলিত হয় না।

## শ্লোক ২৩

**প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্ ।**
**তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ ॥ ২৩ ॥**

**প্রকৃতিঃ**—জড়া প্রকৃতির প্রভাব; **পুরুষস্য**—জীবের; **ইহ**—এখানে; **দহ্যমানা**—দগ্ধ হয়ে; **তু**—কিন্তু; **অহঃ-নিশম্**—দিবা-রাত্র; **তিরঃ-ভবিত্রী**—তিরোহিত হয়; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **অগ্নেঃ**—অগ্নির; **যোনিঃ**—আবির্ভাবের কারণ; **ইব**—যেন; **অরণিঃ**—অরণি কাষ্ঠ।

## অনুবাদ

**জড়া প্রকৃতির প্রভাব জীবকে আবৃত করে রেখেছে, এবং তার ফলে মনে হয় যেন জীব নিরন্তর জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে। কিন্তু ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করার ফলে, এই প্রভাব দূর করা সম্ভব, ঠিক যেমন কাষ্ঠ থেকে উৎপন্ন আগুনে সেই কাষ্ঠই ভস্ম হয়ে যায়।**

## তাৎপর্য

অগ্নি কাষ্ঠখণ্ডে সংরক্ষিত থাকে, এবং অবস্থা অনুকূল হলে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। কিন্তু যেই কাষ্ঠ থেকে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, ঠিকমতো ব্যবহার করলে, সেই কাষ্ঠও অগ্নিতে ভস্ম হয়ে যায়। তেমনই জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনার ফলে এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়ার ফলে, জীব সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। অতএব তার প্রধান রোগ হচ্ছে যে, সে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায় অথবা সে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায়। কর্মীরা প্রকৃতির সম্পদ নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করে, প্রকৃতির প্রভু সেজে ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টা করে, মুক্তিকামী জ্ঞানীরা জড়া প্রকৃতির সম্পদ উপভোগ করার চেষ্টায় নিরাশ হয়ে, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায় অথবা তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চায়। এই দুই প্রকার

রোগের কারণ হচ্ছে জড় কলুষ। এই জড় কলুষ ভস্মীভূত করা যায় ভগবদ্ভক্তির দ্বারা, কারণ ভগবদ্ভক্তিতে এই দুইটি রোগ, যথা—জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনা এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা, অনুপস্থিত। তাই কৃষ্ণভাবনায় সাবধানতা সহকারে ভক্তির অনুষ্ঠান হলে, সংসার বন্ধনের কারণ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

আপাত দৃষ্টিতে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তকে সর্বদাই কর্মে ব্যস্ত একজন মহান কর্মী বলে মনে হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের কার্যকলাপের আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তিনি যা কিছু করেন তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই করেন। তাকে বলা হয় ভক্তি। আপাত দৃষ্টিতে অর্জুন ছিলেন একজন যোদ্ধা, কিন্তু যুদ্ধ করার দ্বারা তিনি যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করেছিলেন, তখন তিনি ভক্ত হয়েছিলেন। ভগবদ্ভক্ত যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানবার জন্য সর্বদাই দার্শনিক গবেষণায় যুক্ত থাকেন, তখন তাঁর কার্যকলাপ একজন মনোধর্মী জ্ঞানীর কার্যকলাপের মতো বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি পরা প্রকৃতি এবং দিব্য কার্যকলাপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করছেন। এইভাবে যদিও দার্শনিক চিন্তাধারার প্রবণতা তাঁর মধ্যে রয়েছে, তবুও তাঁর মধ্যে সকাম কর্মের ফল এবং মনোধর্মী জ্ঞানের লেশ তাতে নেই, কেননা তাঁর এই সমস্ত কার্যকলাপ পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য।

## শ্লোক ২৪

**ভুক্তভোগা পরিত্যক্তা দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ ।**
**নেশ্বরস্যাশুভং ধত্তে স্বে মহিম্নি স্থিতস্য চ ॥ ২৪ ॥**

**ভুক্ত**—ভোগ করা হয়েছে; **ভোগা**—ভোগ; **পরিত্যক্তা**—পরিত্যাগ করে; **দৃষ্ট**—দেখে; **দোষা**—দোষ; **চ**—এবং; **নিত্যশঃ**—সর্বদা; **ন**—না; **ঈশ্বরস্য**—স্বতন্ত্র ব্যক্তির; **অশুভম্**—হানি; **ধত্তে**—প্রদান করেন; **স্বে মহিম্নি**—তার নিজের মহিমায়; **স্থিতস্য**—অবস্থিত; **চ**—এবং।

### অনুবাদ

**জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনার দোষ দর্শন করে, এবং তাই তা পরিত্যাগ করে, জীব তখন স্বতন্ত্র হয় এবং স্বীয় মহিমায় স্থিত হয়।**

## তাৎপর্য

যেহেতু জীব জড়া প্রকৃতির ভোক্তা নয়, তাই প্রকৃতিকে ভোগ করার তার সমস্ত প্রচেষ্টা চরমে নিরাশ হয়। সেই নৈরাশ্যের ফলে, সে সাধারণ জীবের থেকে অধিক শক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, এবং পরম ভোক্তার অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চায়। এইভাবে সে অধিক ভোগের পরিকল্পনা করে।

কেউ যখন প্রকৃতই ভগবদ্ভক্তিতে স্থিত হন, তখন সেটিই হচ্ছে তাঁর স্বতন্ত্র স্থিতি। অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা ভগবানের নিত্য দাসের স্তর বুঝতে পারে না। 'দাস' শব্দটির ব্যবহারের ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়; তারা বুঝতে পারে না যে, এই দাসত্ব জড় জগতের দাসত্বের মতো নয়। ভগবানের দাস হওয়া সব চাইতে উচ্চ পদ। কেউ যদি সেই কথা বুঝতে পেরে ভগবানের নিত্য দাসত্বের স্বাভাবিক পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন। জীব জড় জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে, তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে। চিন্ময় ক্ষেত্রে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে, এবং তাই সেখানে জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। ভগবদ্ভক্ত সেই স্তর লাভ করেন, এবং তাই তিনি জড় সুখভোগের দোষ দর্শন করে, সেই প্রবণতা পরিত্যাগ করেন।

ভগবদ্ভক্ত এবং নির্বিশেষবাদীদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, নির্বিশেষবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, যাতে তারা নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভোগ করার সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করে, ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। সেটিই হচ্ছে তাঁর মহিমান্বিত স্বরূপের স্থিতি। তখন তিনি ঈশ্বর, পূর্ণরূপে স্বাধীন। প্রকৃত ঈশ্বর বা পরমেশ্বর, বা পূর্ণ স্বতন্ত্র হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। জীব যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখনই কেবল তিনি ঈশ্বর। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবানের প্রেমময়ী সেবা থেকে যে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করা যায়, তাই হচ্ছে প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য।

## শ্লোক ২৫

**যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ ।**
**স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্পতে ॥ ২৫ ॥**

**যথা**—যেমন; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **অপ্রতিবুদ্ধস্য**—নিদ্রিত ব্যক্তির; **প্রস্বাপঃ**—স্বপ্ন; **বহু-অনর্থ-ভৃৎ**—বহু অনর্থ উৎপন্ন করে; **সঃ এব**—সেই স্বপ্ন; **প্রতিবুদ্ধস্য**—জাগ্রত ব্যক্তির; **ন**—না; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **মোহায়**—মোহাচ্ছন্ন করার জন্য; **কল্পতে**—সমর্থ।

## অনুবাদ

**স্বপ্নাবস্থায় মানুষের চেতনা প্রায় আচ্ছাদিত থাকে, এবং তখন নানা প্রকার অশুভ বস্তু দর্শন হয়, কিন্তু যখন সে জেগে উঠে পূর্ণ চেতনায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন আর এই সমস্ত অশুভ বস্তু তাকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারে না।**

## তাৎপর্য

স্বপ্নাবস্থায় জীবের চেতনা যখন প্রায় আচ্ছাদিত থাকে, তখন নানা প্রকার প্রতিকূল বস্তুর দর্শন হতে পারে, যা তার উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার কারণ, কিন্তু সে যখন জেগে উঠে, তখন যদিও স্বপ্নে সে যা দেখেছিল তা স্মরণ করতে পারে, তবুও সে আর বিচলিত হয় না। তেমনই আত্ম উপলব্ধির স্তর বা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের প্রকৃত সম্পর্কের উপলব্ধি জীবকে পূর্ণরূপে প্রসন্ন করে, এবং জড়া প্রকৃতির তিন গুণ যা জড় জগতে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করছে, তা আর তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। কলুষিত চেতনায় মানুষ সব কিছুই তার ভোগের সামগ্রী বলে দর্শন করে, কিন্তু শুদ্ধ চেতনায় বা কৃষ্ণচেতনায় সে দেখে যে, সব কিছুই বিরাজ করছে পরম ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবানের ভোগের জন্য। সেইটি হচ্ছে স্বপ্নাবস্থা এবং জাগ্রত অবস্থার পার্থক্য। কলুষিত চেতনাকে স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং কৃষ্ণচেতনাকে জীবনের জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ অনুসারে, কেবল শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ভোক্তা। ত্রিভুবনের সব কিছুর অধীশ্বর হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি সকলের পরম বন্ধু, সেই কথা বুঝতে পারার ফলেই শান্তিময় এবং স্বতন্ত্র হওয়া যায়। বদ্ধ জীবের যতক্ষণ পর্যন্ত এই জ্ঞান না থাকে, ততক্ষণ সে সব কিছুর ভোক্তা হতে চায়। সে মানব-হিতৈষী হয়ে বা পরোপকারী হয়ে মানুষদের জন্য হাসপাতাল এবং স্কুল খুলতে চায়। এই সবই মায়া, কেননা এই প্রকার জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা কারোরই কোন রকম মঙ্গল সাধন করা যায় না। কেউ যদি আর পাঁচ জনের যথার্থ উপকার করতে চান, তা হলে তাঁর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, তাদের সুপ্ত কৃষ্ণভাবনা জাগ্রত করা। কৃষ্ণভক্তির অবস্থাকে বলা হয় *প্রতিবুদ্ধ*, অর্থাৎ 'বিশুদ্ধ চেতনা।'

## শ্লোক ২৬

**এবং বিদিততত্ত্বস্য প্রকৃতির্ময়ি মানসম্ ।**
**যুঞ্জতো নাপকুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ ॥ ২৬ ॥**

**এবম্**—এইভাবে; **বিদিত-তত্ত্বস্য**—পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে যিনি অবগত তাঁকে; **প্রকৃতিঃ**—জড়া প্রকৃতি; **ময়ি**—আমাতে; **মানসম্**—মন; **যুঞ্জতঃ**—যুক্ত করে; **ন**—না; **অপকুরুতে**—অপকার করতে পারে; **আত্ম-আরামস্য**—যিনি আত্মায় আনন্দময় তাঁকে; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

## অনুবাদ

**আত্মারাম ব্যক্তি জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হলেও, জড়া প্রকৃতির প্রভাব কখনও তাঁর অপকার করতে পারে না, কেননা তিনি পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত, এবং তাঁর মন পরমেশ্বর ভগবানে স্থির হয়েছে।**

## তাৎপর্য

ভগবান কপিলদেব বলেছেন যে, *ময়ি মানসম্*, যে-ভক্তের মন সর্বদাই ভগবানের চরণ-কমলে স্থির হয়েছে, তাকে বলা হয় *আত্মারাম* অথবা *বিদিততত্ত্ব*। *আত্মারাম* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যিনি আত্মায় রমণ করেন', অথবা 'যিনি চিন্ময় পরিবেশে আনন্দ উপভোগ করেন।' জড় বিচারে *আত্মা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে দেহ অথবা মন, কিন্তু সেই শব্দটি যখন এমন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়, যাঁর মন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবদ্ধ হয়েছে, তখন *আত্মারাম* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যিনি পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত পারমার্থিক কার্যকলাপে নিযুক্ত হয়েছেন।' পরম আত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং স্বতন্ত্র আত্মা হচ্ছে জীব। জীবাত্মা যখন পরম আত্মার সেবায় যুক্ত হন এবং ভগবানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন, তখন জীব *আত্মারাম* স্থিতি লাভ করেছেন বলা হয়। *আত্মারাম* স্থিতি তিনিই লাভ করতে পারেন যিনি যথাযথভাবে তত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন। তত্ত্বটি এই যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন ভোক্তা এবং জীব তাঁর ভোগ্য এবং সেবক। যিনি এই সত্যকে জানেন, এবং তাঁর সব কিছু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে চেষ্টা করেন, তিনি সমস্ত জড়-জাগতিক প্রতিক্রিয়া এবং জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন।

এই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ঠিক যেমন একজন জড়বাদী এক বিশাল গগনচুম্বী প্রাসাদ বানায়, তেমনই ভগবদ্ভক্তও ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন। আপাত দৃষ্টিতে, সেই গগনচুম্বী প্রাসাদ নির্মাতা এবং মন্দির নির্মাতাকে একই স্তরে অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়, কারণ উভয়েই কাঠ, পাথর, লোহা এবং গৃহ নির্মাণের অন্যান্য সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করছেন। কিন্তু যিনি একটি গগনচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করছেন, তিনি একজন জড়বাদী, আর যিনি মন্দির নির্মাণ

করছেন, তিনি হচ্ছেন *আত্মারাম*। জড়বাদী গগনচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করে, তার দেহের সম্পর্কে নিজের তৃপ্তি সাধন করতে চায়, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত মন্দির নির্মাণ করে, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবানের তৃপ্তি সাধন করার চেষ্টা করেন। যদিও তাঁরা উভয়েই ভৌতিক কার্যকলাপের সংসর্গযুক্ত, তবুও ভগবদ্ভক্ত মুক্ত, এবং জড়বাদী বদ্ধ। তার কারণ হচ্ছে মন্দির নির্মাণ করছেন যে ভক্ত, তিনি তাঁর মনকে পরমেশ্বর ভগবানে নিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু অভক্ত, যে গগনচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করছে, তার মন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনে মগ্ন। যে কোন কার্য সম্পাদন করার সময়, এমন কি এই জড় জগতেও, মন যদি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থির থাকে, তা হলে তিনি বদ্ধ হবেন না। পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় যিনি ভক্তিময়ী সেবায় যুক্ত, তিনি সর্বদাই জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত।

## শ্লোক ২৭

**যদৈবমধ্যাত্মরতঃ কালেন বহুজন্মনা ।**
**সর্বত্র জাতবৈরাগ্য আব্রহ্মভুবনান্মুনিঃ ॥ ২৭ ॥**

**যদা**—যখন; **এবম্**—এইভাবে; **অধ্যাত্ম-রতঃ**—আত্ম-উপলব্ধিতে যুক্ত; **কালেন**—বহু বর্ষ যাবৎ; **বহু-জন্মনা**—বহু জন্ম ধরে; **সর্বত্র**—সমস্ত জায়গায়; **জাত-বৈরাগ্যঃ**—বিরক্তি উৎপন্ন হয়; **আ-ব্রহ্ম-ভুবনাৎ**—ব্রহ্মলোক পর্যন্ত; **মুনিঃ**—চিন্তাশীল ব্যক্তি।

### অনুবাদ

**কেউ যখন বহু বর্ষব্যাপী এবং বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভগবৎ-সেবা এবং আত্ম উপলব্ধিতে এইভাবে যুক্ত হন, তিনি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত এই জড় জগতের যে-কোন লোকের সুখ উপভোগের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত হন; তাঁর চেতনা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়।**

### তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিতে যুক্ত ব্যক্তিকে বলা হয় ভক্ত। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত এবং মিশ্র ভক্তের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মিশ্র ভক্ত পারমার্থিক লাভের জন্য ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, যাতে তিনি পূর্ণজ্ঞান এবং আনন্দ সহকারে ভগবানের দিব্য ধামে নিত্যকাল অবস্থান করতে পারেন। জড় জগতে কোন ভক্ত যখন পূর্ণরূপে শুদ্ধ না হন, তিনি জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তিরূপে ভগবানের কাছ থেকে

জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশা করেন, ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি সাধন করতে চান, অথবা পরমেশ্বর ভগবানের বাস্তবিক স্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্ত হতে চান। কেউ যখন এই সমস্ত অবস্থার অতীত হন, তাঁকে বলা হয় শুদ্ধ ভক্ত। তিনি কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের জন্য অথবা পরমেশ্বর ভগবানকে জানার জন্য ভগবানের সেবায় যুক্ত হন না। তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে ভালবাসেন বলে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধানে যুক্ত হওয়াই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

শুদ্ধ ভক্তির সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে বৃন্দাবনের গোপিকারা। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে আগ্রহী ছিলেন না, তাঁরা কেবল শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে চেয়েছিলেন। এই প্রেম হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির শুদ্ধ অবস্থা। ভক্তির এই শুদ্ধ অবস্থায় উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত, উচ্চতর জড়-জাগতিক পদে উন্নীত হওয়ার প্রবণতা থাকে। মিশ্র ভক্ত ব্রহ্মালোকের মতো উচ্চতর লোকে, দীর্ঘ আয়ু-সমন্বিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় পূর্ণ জীবন উপভোগের বাসনা করতে পারেন। এই সবই জড় বাসনা, কিন্তু যেহেতু মিশ্র ভক্ত ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাই চরমে, বহু বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে জড় সুখ উপভোগ করার পর, তাঁর কৃষ্ণভক্তি নিঃসন্দেহে বিকশিত হবে, এবং এই কৃষ্ণভক্তির লক্ষণ হচ্ছে যে, তিনি আর কোন প্রকার উন্নততর জড়-জাগতিক জীবনে আগ্রহী হবেন না। এমন কি তিনি ব্রহ্মার মতো ব্যক্তি হওয়ারও আকাঙ্ক্ষা করেন না।

## শ্লোক ২৮-২৯

**মদ্ভক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়সা ।**
**নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ম্ ॥ ২৮ ॥**
**প্রাপ্নোতীহাঞ্জসা ধীরঃ স্বদৃশাচ্ছিন্নসংশয়ঃ ।**
**যদ্গত্বা ন নিবর্তেত যোগী লিঙ্গাদ্বিনির্গমে ॥ ২৯ ॥**

**মৎ-ভক্তঃ**—আমার ভক্ত; **প্রতিবুদ্ধ-অর্থঃ**—আত্ম উপলব্ধ; **মৎ-প্রসাদেন**—আমার অহৈতুকী কৃপার দ্বারা; **ভূয়সা**—অন্তহীন; **নিঃশ্রেয়সম্**—পরম সিদ্ধি; **স্ব-সংস্থানম্**—তাঁর আলয়; **কৈবল্য-আখ্যম্**—কৈবল্য নামক; **মৎ-আশ্রয়ম্**—আমার আশ্রয়ে; **প্রাপ্নোতি**—লাভ করেন; **ইহ**—এই জীবনে; **অঞ্জসা**—সত্য সত্যই; **ধীরঃ**—ধীর; **স্ব-দৃশা**—আত্মজ্ঞানের দ্বারা; **ছিন্ন-সংশয়ঃ**—সংশয় থেকে মুক্ত; **যৎ**—সেই ধামে; **গত্বা**—গমন করে; **ন**—কখনই না; **নিবর্তেত**—ফিরে আসেন; **যোগী**—যোগী ভক্ত; **লিঙ্গাৎ**—সূক্ষ্ম এবং স্থূল জড় দেহ থেকে; **বিনির্গমে**—প্রস্থানের পর।

## অনুবাদ

**আমার ভক্ত প্রকৃত পক্ষে আমার অন্তহীন অহৈতুকী কৃপার দ্বারা আত্ম উপলব্ধি লাভ করেন, এবং তার ফলে, সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে, তিনি তাঁর গন্তব্য ধামের প্রতি অবিচলিতভাবে অগ্রসর হন, যা আমার অনাবিল আনন্দময় পরা শক্তির আশ্রয়াধীন। সেটিই হচ্ছে জীবের চরম সিদ্ধির পরম লক্ষ্য। তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার পর, যোগীভক্ত সেই দিব্য ধামে গমন করেন এবং সেখান থেকে তিনি আর কখনও ফিরে আসেন না।**

## তাৎপর্য

প্রকৃত আত্ম উপলব্ধি হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া। ভক্তের অস্তিত্বের অর্থ হচ্ছে ভক্তির কার্য এবং ভক্তির বিষয়। আত্ম উপলব্ধির চরম অর্থ হচ্ছে ভগবান ও জীবকে জানা। স্বতন্ত্র জীবকে জানা এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর প্রেমময়ী সেবার আদান-প্রদানই হচ্ছে প্রকৃত আত্ম উপলব্ধি। নির্বিশেষবাদী অথবা অন্যান্য অধ্যাত্মবাদীরা তা প্রাপ্ত হতে পারে না। তারা ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ভগবানের অন্তহীন অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভগবদ্ভক্তি শুদ্ধ ভক্তের কাছে প্রকাশিত। ভগবান এই কথা বিশেষভাবে এখানে বলেছেন—*মৎপ্রসাদেন*, "আমার বিশেষ কৃপায়।" সেই কথা ভগবদ্গীতাতে প্রতিপন্ন হয়েছে। যাঁরা প্রেম এবং শ্রদ্ধা সহকারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তাঁরাই কেবল উপযুক্ত বুদ্ধি প্রাপ্ত হন, যার দ্বারা তাঁরা ক্রমশ ভগবানের ধামের প্রতি অগ্রসর হতে পারেন।

*নিঃশ্রেয়স* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'চরম গন্তব্য স্থল।' *স্বসংস্থান* সূচিত করে যে, নির্বিশেষবাদীদের বাস করার কোন বিশেষ স্থান নেই। নির্বিশেষবাদীরা তাদের ব্যক্তিত্ব উৎসর্গ করে, যাতে চিৎ-স্ফুলিঙ্গ ভগবানের চিন্ময় দেহনির্গত নির্বিশেষ জ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের বিশেষ স্থান রয়েছে। গ্রহগুলি সূর্যের কিরণে বিরাজ করছে, কিন্তু সূর্য-কিরণের কোন নির্দিষ্ট আশ্রয়স্থল নেই। কেউ যখন কোন বিশেষ গ্রহে উপস্থিত হন, তখন তাঁর একটি আশ্রয়স্থল থাকে। চিদাকাশ, যাকে কৈবল্য বলা হয়, তা কেবল সর্বত্রই এক আনন্দময় জ্যোতি, এবং তা পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয়ে সংরক্ষিত। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (১৪/২৭) বলা হয়েছে, *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*—নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি পরমেশ্বর ভগবানের শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে। অর্থাৎ, ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা হচ্ছে কৈবল্য বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম। সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে চিন্ময় লোকসমূহ রয়েছে, যেগুলি বৈকুণ্ঠলোক নামে পরিচিত, এবং তাদের মধ্যে প্রধান

হচ্ছে কৃষ্ণলোক। কোন কোন ভক্ত বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হন, এবং কেউ কৃষ্ণলোকে উন্নীত হন। ভক্তের বিশেষ বাসনা অনুসারে, তাঁকে বিশেষ ধাম প্রদান করা হয়, যাকে বলা হয় *স্বসংস্থান* বা তাঁর ঈপ্সিত গন্তব্যস্থল। ভগবানের কৃপায়, ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত স্বরূপ-সিদ্ধ ভক্ত এই জড় দেহে থাকার সময়ও তাঁর গন্তব্যস্থল হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তাই তিনি নিষ্ঠা সহকারে, নিঃসংশয়ে ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করেন, এবং তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ধামে উপস্থিত হন, যেখানে যাওয়ার জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। সেই ধামে পৌঁছাবার পর, তিনি আর কখনও এই জড় জগতে ফিরে আসেন না।

এই শ্লোকে *লিঙ্গাদ্বিনির্গমে* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সূক্ষ্ম এবং স্থূল, এই দুই প্রকার জড় দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার পর।' সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হয় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত বা কলুষিত চেতনা দিয়ে, আর স্থূল শরীর গঠিত হয় মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচটি তত্ত্ব দিয়ে। কেউ যখন চিৎ-জগতে স্থানান্তরিত হন, তখন তিনি এই জড় জগতের সূক্ষ্ম এবং স্থূল দুইটি শরীরই পরিত্যাগ করেন। তিনি তাঁর শুদ্ধ চিন্ময় দেহে চিদাকাশে প্রবেশ করেন এবং সেখানে চিন্ময় গ্রহগুলির মধ্যে কোন একটিতে অবস্থিত হন। নির্বিশেষবাদীরা যদিও তাঁদের সূক্ষ্ম এবং স্থূল জড় শরীর ত্যাগ করার পর চিদাকাশে গমন করেন, তবুও তাঁরা কোন চিন্ময় লোকে স্থান লাভ করতে পারেন না; তাঁদের বাসনা অনুসারে, তাঁদের ভগবানের চিন্ময় দেহনির্গত ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে দেওয়া হয়। *স্বসংস্থানম্* শব্দটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জীব যেভাবে নিজেকে তৈরি করে, সেইভাবে সে তার বাসস্থান প্রাপ্ত হয়। নির্বিশেষবাদীদের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি প্রদান করা হয়, কিন্তু যাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের চিন্ময় নারায়ণ রূপের সঙ্গে অথবা কৃষ্ণলোকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গ করতে চান, তাঁরা সেই ধামে গমন করেন, যেখান থেকে তাঁরা আর কখনও ফিরে আসেন না।

## শ্লোক ৩০

**যদা ন যোগোপচিতাসু চেতো**
**মায়াসু সিদ্ধস্য বিষজ্জতেঽঙ্গ ।**
**অনন্যহেতুষ্বথ মে গতিঃ স্যাদ্**
**আত্যন্তিকী যত্র ন মৃত্যুহাসঃ ॥ ৩০ ॥**

**যদা**—যখন; **ন**—না; **যোগ-উপচিতাসু**—যোগের দ্বারা প্রাপ্ত শক্তিতে; **চেতঃ**—চিত্ত; **মায়াসু**—মায়ার প্রকাশ; **সিদ্ধস্য**—সিদ্ধ যোগীর; **বিষজ্জতে**—আকৃষ্ট হয়; **অঙ্গ**—হে মাতঃ; **অনন্য-হেতুষু**—যার অন্য আর কোন কারণ নেই; **অথ**—তখন; **মে**—আমাকে; **গতিঃ**—তাঁর প্রগতি; **স্যাৎ**—হয়; **আত্যন্তিকী**—অসীম; **যত্র**—যেখানে; **ন**—না; **মৃত্যু-হাসঃ**—মৃত্যুর শক্তি।

## অনুবাদ

**সিদ্ধ যোগীর চিত্ত যখন বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রকাশিত যোগ-সিদ্ধির প্রতি আর আকৃষ্ট হয় না, তখন তিনি আমার প্রতি আত্যন্তিক গতি প্রাপ্ত হন, এবং তখন মৃত্যু আর তাঁকে পরাভূত করতে পারে না।**

## তাৎপর্য

যোগীরা সাধারণত যোগসিদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট, কারণ, সেই সিদ্ধির প্রভাবে তারা ক্ষুদ্রতম থেকে ক্ষুদ্রতর হতে পারে অথবা বৃহত্তম থেকে বৃহত্তর হতে পারে, তাদের ইচ্ছা অনুসারে যা কিছু প্রাপ্ত হতে পারে, এমন কি একটি গ্রহ পর্যন্ত নির্মাণ করতে পারে, অথবা তাদের ইচ্ছা অনুসারে যে-কোন ব্যক্তিকে বশীভূত করতে পারে। যে-সমস্ত যোগীদের ভগবদ্ভক্তির ফল সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান নেই, তারাই সমস্ত সিদ্ধির দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু এই সমস্ত সিদ্ধিগুলি জড়-জাগতিক; পারমার্থিক প্রগতির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। জড় শক্তির দ্বারা যেমন অন্যান্য জড় শক্তি সৃষ্টি হয়, যোগসিদ্ধিও তেমনই জড়-জাগতিক। সিদ্ধ যোগীর চিত্ত কখনও কোন প্রকার জড় শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অনন্য সেবার প্রতি আকৃষ্ট হন। ভক্তের কাছে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার পন্থা নারকীয় বলে মনে হয়, এবং তিনি সমস্ত যোগসিদ্ধি অথবা ইন্দ্রিয়গুলি দমন করার সমস্ত ক্ষমতা আপনা থেকেই লাভ করেন। স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়াকে তিনি আকাশকুসুম বলে মনে করেন। ভগবদ্ভক্তের চিত্ত কেবল ভগবানের শাশ্বত প্রেমময়ী সেবাতেই একাগ্র হয়, এবং তাই মৃত্যুর ক্ষমতা তাঁর উপর কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এই প্রকার ভক্তিময়ী স্থিতিতে, সিদ্ধ যোগী অমৃতময় জ্ঞান এবং আনন্দের পথ প্রাপ্ত হতে পারেন।

*ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'জড়া প্রকৃতির উপলব্ধি' নামক সপ্তবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।*